আমেরিকার পথে

ডঃ রেবতীমোহন বিশ্বাস

আমেরিকার পথে

ডঃ রেবতীমোহন বিশ্বাস

এম. এ. (ক্যাল্) পি. এইচ-ডি (ইউ এস. এ.)

আলফা পাবলিশিং হাউস্

সৎসঙ্গ

বিহার, ইণ্ডিয়া

প্রকাশক—শ্রীমতি প্রতিমা বিশ্বাস
অলকা পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার, ইন্ডিয়া

প্রথম প্রকাশ—৫ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৪
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ ইং
(তালনবমী তিথি)

দ্বিতীয় প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৮৮ (১৯৮১)
তৃতীয় প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৯৮
চতুর্থ প্রকাশ—নববর্ষ ১৪০১
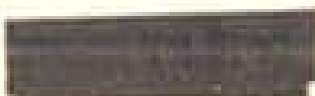
মূল্য- চল্লিশ টাকা

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান :

ডঃ রেবতীমোহন বিশ্বাস
ভজনম্ লজ
পুরন্দহ
পোঃ বি. দেওঘর
জেঃ দেওঘর
পিন—৮১৪১১২

বি. এ. চৌধুরী
৬৮৩ নিউ ষ্টেশন রোড
পোঃ ভদ্রকালি, হুগলি

"মা"

যাঁর প্রেরণা ও

আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে

সুদূরে পাড়ি দিয়েছিলাম

সেই আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রী বড়দার

শ্রীচরণকমলে

উৎসর্গ করলাম

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আজ দীর্ঘ দুই বৎসর হল "আমেরিকার পথে" বই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের বহু মানুষ অনুরোধ করেছেন বইখানি পুনর্মুদ্রণের জন্য। তাদের ঐকান্তিক আগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হলাম।

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও ইচ্ছা পূরণের ধ্বজা মাথায় নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলাম। সুদূর বিদেশে অজস্র প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের মাঝে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা কিভাবে তাঁর এই দীন সেবককে কৃতকার্যতায় ভূষিত করেছিল তার যৎসামান্য ইতিবৃত্ত সহস্র সহস্র পাঠক-পাঠিকার অন্তরে যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা ভাবতেও পারিনি। দেশের বহু জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষাবিদ্, নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্র এবং বিশেষ করে তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পেয়েছি তা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, "আমেরিকার পথে আধ্যাত্মিক অভিযানের এক বিচিত্র কাহিনী," "আমেরিকার পথে বিশ্বাস, ভক্তি, দৃঢ় সঙ্কল্প ও তপস্যার এক অপূর্ব সমন্বয়," "জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত মানুষকে আশা ভরসা ও প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করে তোলার পথে 'আমেরিকার পথে' এক জীবন্ত উৎস," "গুরুর আদেশ পালনের ঐকান্তিক আগ্রহে মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে 'আমেরিকার পথে' বই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।"

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনের অর্থ, সহযোগিতা ও প্রেরণা দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীমান অরুণ কুমার বসু, শ্রীযুত প্রভাস চন্দ্র পোদ্দার, শ্রীযুত বিজয় ঘোষ, শ্রীমান স্বপনকুমার কর্মকার, ও শ্রীমান অনিমেষ চৌধুরীর কথা উল্লেখ না করে পারছি না। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরে ভক্তি, বিশ্বাস ও সংকল্পের সমন্বয় সৃষ্টি করে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে জীবনের পরম আশ্রয়রূপে বোধ করতে সাহায্য করবে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

ইতি

গ্রন্থকার

শ্রীরেবতীমোহন বিশ্বাস

ভূমিকা

আমেরিকা পরিভ্রমণ করে ভারতে ফিরে এলাম ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার শুরু হ'ল পূর্বের জীবনধারা,—ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া ও পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন ও মহিমা-কীর্তন করা। যাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা আমাকে প্রেরণা-প্রবুদ্ধ করেছে, যাঁরা দয়ালের চরণে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছেন আমার কৃতকার্যতার জন্য, সেই সহস্র সহস্র গুরুভাইদের কাছ থেকে বার বার অনুরোধ আসতে লাগল—"দাদা—আমেরিকাতে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুকী করুণায় অসাধ্য সাধন করে এসেছেন। সেই অভিজ্ঞতা যদি লেখেন তবে বড় ভাল হয়।" তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে লিখতে শুরু করলাম। সে লেখা সৎসঙ্গ মুখপত্র 'আলোচনা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে কিছুদিন। কিন্তু নানা কারণে আর 'আলোচনা'য় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। পাঠকবর্গের কাছ থেকে আবার অনুরোধ আসতে লাগল বই আকারে প্রকাশ করার জন্য। সোদরপ্রতীম শ্রদ্ধেয় শিশির ঘোষ দা'র প্রচেষ্টায় বইখানা আত্মপ্রকাশ করল। "আমেরিকার পথে" নামটি দিয়েছিল সৎসঙ্গের নিয়ত কর্মী স্নেহভাজন শ্রীমান বিপ্লবকুমার গুপ্ত।

আমেরিকার বিভিন্ন তথ্য বহু বইতেই বর্ণিত আছে। সেদিক থেকে বইখানা পাঠকদের কাছে কতখানি তথ্যমূলক হবে তা তাঁরাই বিচার করবেন। তবে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালবাসেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, যাঁরা স্বীকার করেন,—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যদ্ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

সেই ভক্তবৃন্দের জন্য রইল পরমদয়াল ঠাকুরের এই দীন সেবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কেমন ক'রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সাত সাগর তের নদী পার হয়ে যেয়ে, আইন আদালত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মানসিক ভাব-বৈষম্য, প্রবৃত্তি-প্রলোভী পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে অতিক্রম ক'রে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে সেই ইতিহাসই আছে এই নিবন্ধে। ইষ্টের ইচ্ছাকে পূরণ করার আকুলতা নিয়ে মানুষ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে পরম পিতাই যে সর্বরকমে তাকে সাহায্য করেন তার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পড়ে কারও জীবনে বিশ্বাসের ভাণ্ডার যদি পূর্ণ হয়ে ওঠে, দয়ালের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাস্তবভাবে সে যদি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তবেই সার্থক হবে আমার এই অভিজ্ঞতার বর্ণনার।

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই পরমদয়াল ঠাকুরের রাতুল চরণে। ইতি

তাঁরই দীন সেবক
রেবতীমোহন বিশ্বাস

আমেরিকার পথে

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ছ'টায় (১২ই জুলাই, ১৯৭০ সাল) এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং জেট ৭০৭ লণ্ডনের হীথ্ বিমানবন্দর ত্যাগ করল। প্লেনের ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে যাত্রীদেরকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল,—আমরা নিউইয়র্ক রওনা হচ্ছি। নিউইয়র্কের সময় এখন সকাল ৭-১৫ মিঃ। আবহাওয়া ভাল, যদিও মেঘ আছে আকাশে: তবে আমরা মেঘের বহু ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ঘন্টায় পাঁচশ মাইল বেগে তেত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। সামনে আটলাণ্টিক মহাসাগর। এই মহাসাগর পাড়ি দিতে সাত ঘন্টা সময় লাগবে। আর, ৭ ঘন্টা ৪০ মিনিটে আমরা নিউইয়র্কে অবতরণ করব।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে চলেছে। অপূর্ব সে-দৃশ্য। মাথার ওপরে নীল মহাকাশ,—নিষ্কলঙ্ক মহাশূন্য। আবার নীচেও মহাসাগরের অসীম নীল জলরাশি। মনে হচ্ছে দুই সীমাহীন মহাকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে চলেছি আমরা। ওপরের মহাকাশ কলঙ্কবিহীন নীলে ঢাকা। নীচের দিগন্ত বিস্তৃত নীল সাগরের বুকে ইতস্ততঃ সাদা মেঘের স্তূপ। পৃথিবীর মাটি থেকে যেমন দেখা যায় আকাশকে, ঠিক তেমনই দেখা যাচ্ছে মহাসাগরে আবৃত ধরণীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণকে।

হঠাৎ মাথার ওপরে এয়ার-হোষ্ট-এর কণ্ঠ ভেসে উঠল, "অ্যাটেনশান্ প্লীজ।"

সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম, ইকনমিক্ ক্লাসের লম্বা প্যাসেজে তিনজন এয়ার-হোষ্ট অক্সিজেন্ মাস্ক্ হাতে নিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে তা' ব্যবহার করতে হবে! বলছেন,—আমরা আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি। যদি কোন কারণে জলের ওপরে নামতে বাধ্য হই, তাহলে, 'এই ভাবে' লাইফ বেল্ট ও অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সশব্দ গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। বুঝলাম, 'জলের ওপরে নামতে বাধ্য হই' কথাটা নিতান্তই স্তোকবাক্য। জলের ওপরে নামা মানেই হচ্ছে পাতালপুরীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা।

হঠাৎ কী একটা অজানা আশঙ্কায় মন-প্রাণ গভীর বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। একটা অসহায় অবস্থা সমগ্র সত্তাকে যেন মুচড়ে ফেলছে। হতাশার কঙ্কাল-স্পর্শে হিম-শীতল হয়ে উঠল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। অন্তরের চাপা কান্না অজগরের মত মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পাঁজরার হাড়গুলি ভেঙেচুরে। চেপে রেখেছি অতিকষ্টে। কিন্তু চোখ দুটো ভরে উঠেছে জলে। ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠছে যাত্রাকালীন দৃশ্য :

ঠাকুর-বাংলোয় খড়ের ঘরে বসে আছেন শ্রীশ্রীবড়দা। বড় সাধ তাঁর পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে যাই সাগর পাড়ে। মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন তিনি। পা দুটো এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। প্রাণভরে হাত বুলিয়ে দিলাম তাঁর চরণ-কমল যুগলে। পুরুষোত্তম পরমদয়ালের চরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছে অনেকবার। কিন্তু পদসেবা করার সুযোগ পাইনি কোন দিন। তাই বুঝি দয়াল দয়া ক'রে আমার সে-সাধ মেটালেন তাঁরই জীবন্ত প্রতিভূ 'আচার্যের' চরণ-সেবার ক্ষণিকের সুযোগ দিয়ে।

আমার আর-একটা প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন বড়দা। বললাম, —যদি দয়া ক'রে দু-একটা লাইন লিখে দিতেন এই ডায়েরীতে তাহলে তাই আমায় প্রেরণা যোগাত সুদূর বিদেশে!

'কী বা লিখব?' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হাতের ডায়েরীখানা নিয়ে তার প্রথম পাতায় লিখলেন "ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাই তোমার জীবনের ব্রত হউক। সুখী হও, সবাইকে সুখী কর।—বড়দা।"

প্রণাম করলাম বড়দাকে। স্নেহলকণ্ঠে বললেন, 'সাবধানে থেকো। শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো। কাম হলেই (সারা হলেই) চলে আসবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে গেলাম। কে

একজন বললেন বড়মাকে, রেবতী আজ আমেরিকায় রওনা হচ্ছে। আশীর্বাদ ক'রে দিন।

শ্রীশ্রীবড়মা তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট ভাষায় কি যে বললেন তা সব বোঝা গেল না। যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল, প্রাণঢালা আশীর্বাদ করলেন আমাকে। বিশ্বজননীর চোখেমুখে ফুটে উঠল বরাভয়ের এক প্রশান্ত ইঙ্গিত। মনে পড়ে গেল মায়ের আশীর্বাদ জীবনকে কিভাবে রক্ষা করে বিপদশঙ্কুল, ক্ষুরধার সাধন-মার্গের নানা প্রলোভনের হাত থেকে। ২১ বছর আগে তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে এক বর প্রার্থনা করেছিলাম। মঞ্জুর করেছিলেন তিনি। সে মঞ্জুরী যে কতবড় শক্তিশালী, তা' সারাজীবন ধরে প্রত্যক্ষ ক'রে আসছি। প্রণাম নিবেদন ক'রে বিদায় নিলাম শ্রীশ্রীবড়মার কাছ থেকে।

শ্রীশ্রীবড়দার ঘরে এলাম আবার। প্রণাম করে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে। বার বার পেছন ফিরে দেখি তাঁর মমতামাখা চোখদুটি তখনও চেয়ে আছে আমার যাত্রাপথে। কি এক অপার্থিব করুণার ধারা ঝরে পড়ছে তাঁর ঐ চোখ দুটি থেকে। মনে হচ্ছে, তাঁর অন্তর-চোঁয়ান আশীর্বাদ মৌন ভাষায় বলছে, যাও বীর, বিজয়ী হয়ে ফিরে এস।

যাত্রার সময় হয়ে এল। ষ্টেশন ওয়াগন এসেছে আশ্রম থেকে। বাড়ী ভরতি লোক। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এসেছেন শুভেচ্ছা জানাতে।

কে একজন এসে জানাল, বৌদি তোমায় ভেতরে ডাকছে। ভেতর ঘরে গেলাম। একমাস ষোল দিনের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে প্রণাম করল স্ত্রী। ধরা গলায় বলল, "আমার জন্য সিঁদুর নিয়ে এস।" মুখের দিকে তাকাতে পারল না। আল্‌নার আড়ালে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। এতদিন তো বেশ শক্ত ছিল। বার-বার অনুপ্রাণিত করেছে, দূর দেশ, তাতে কি? পরমপিতার আদেশ ও ইচ্ছা পূরণের জন্য বড়দার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাচ্ছ! ভয় কি

তোমার! বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে। আজ আর কোন কথাই বলতে পারল না। যা' বলল একটু আগে, তা' বোধহয় কেউ শিখিয়ে দিয়েছে বলতে। এতে বুঝি স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আকুল আবেদন লুকিয়ে আছে।

এতদিন আমিও তো শক্ত ছিলাম। কিন্তু আজ। বাবাকে প্রণাম করতেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বাবা। কথা বলতে পারলাম না একটাও। গলা ধরে এল কান্নায়। বহু প্রচেষ্টায় কান্না চেপে রেখে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ, সম্বোধন ও প্রণাম করে ষ্টেশন ওয়াগনে গিয়ে উঠলাম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল।

জসিডি ষ্টেশনের ছবিটা আরও গভীর মর্মবেদনা দিয়ে ফুটে উঠল চোখের সামনে।

নির্দিষ্ট সময় থেকে পঞ্চাশ মিনিট লেটে এল বোম্বে-জনতা-ট্রাই-উইকলি। মার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল এবার। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল আবেগে। মা'র বুকের মাঝে মাথা রেখে বললাম, একা ফিরে আসতে তোমার বেশী কষ্ট হবে বলেই তোমাকে এয়ার-পোর্টে নিয়ে গেলাম না! চিন্তা করো না, শীঘ্রই ফিরে আসব আমি।

সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন মা, 'তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করো না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সবসময় মাথায় রেখে চলবে। তাঁর কাজ সারা হলে তবেই ফিরে এসো।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। যতক্ষণ সম্ভব দেখলাম, মা উদাস নয়নে চেয়ে আছেন গাড়ীর গতিপথে। লাইনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল জসিডি ষ্টেশন।

পরের দিন সকাল থেকেই শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক গুরুভাই দেখা করতে আসছেন ৬৮নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ শাখা সৎসঙ্গ কেন্দ্রে। রওনা হবার সময় যত এগিয়ে আসছে ততই মনটার মধ্যে কেমন যেন করছে।

ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না সে ভাব। এ যেন "তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"

উলের প্যান্ট ও কোট প্রভৃতি পরে তৈরী হচ্ছি। জীবনে স্যুট পরি নাই কোনদিন, টাই তো নয়ই। শুভেন্দুদা শিখিয়ে দিচ্ছেন কেমন ক'রে টাই-এর "নট্" দিতে হয়। এদিক-ওদিক টেনে ঠিক করে দিচ্ছেন যাতে অসুন্দর না থাকে কোথাও।

গুরুভাইরাই দিয়েছেন পোষাক-পরিচ্ছদ, স্যুটকেশ, অ্যাটাচী ইত্যাদি যাবতীয় যা'-কিছু। পাতিপুকুরের সুধীর রায়চৌধুরী একাই দিয়েছেন ৭০০ টাকা মূল্যের দুই সেট্ স্যুট। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তির কথা ভাবতেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। গুরুভাইরা যে আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমার যাবতীয় যা'-কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন তা মনে হতেই বুকখানা তৃপ্তিতে ভরে উঠল যে, এত মানুষের শুভেচ্ছা ও অন্তর চোঁয়ান ভালবাসা রয়েছে আমার মত তাঁর একজন দীন সেবকের জন্য।

৬-১৫ মিঃ। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। উল্টোডাঙ্গা, বেলগাছিয়া প্রভৃতি স্থানে বোমবাজী ও গণ্ডগোল চলছে বলে খবর এল। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীবড়দা ও পূজ্যপাদ বড়দার প্রতিকৃতির সামনে প্রণাম করে উঠলাম হরিপ্রসাদদার 'কারে'। হরিপ্রসাদদা তাঁর ঋত্বিক আশুদার (৺আশুতোষ জোয়ারদার) ব্যবহারের জন্য গাড়ীখানা এখানেই রেখে দেন সব সময়।

হরিপ্রসাদদা গাড়ী চালাচ্ছেন। সঙ্গে শ্রীমান নীলু, আমার মেজভাই শ্রীমান অচিন্ত্য ও ছোটভাই মণি। সাড়ে সাতটায় রিপোর্টিং টাইম। যথাসময়ে দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছালাম। অনেক গুরুভাই বিদায়কালীন শুভেচ্ছা জানাতে বিমানবন্দরে এসেছেন।

এয়ার এজেন্ট এয়ারপোর্টের করণীয় যা'-কিছু করে দিলেন। টিকিট চেকিং, লগেজ বুকিং, ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি সারা হল। মাত্র ৮টা আমেরিকান ডলার আমার পকেটে সম্বল।

এবার কাস্টমস্-এ প্রবেশ করতে হবে। বিদায়ের পালা আসন্ন।

প্রণাম করলাম আশুদাকে। আশুদা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। পাতিপুকুরের দাদারা ও আরও অনেকে শুভেচ্ছা জানালেন। 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল বিমান-বন্দরের 'লাউঞ্জ'। অচিন্ত্য, মণি, সেজভাই বিবেক—সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুঝতে পারছি তাদেরও কষ্ট হচ্ছে মনে মনে। এ এক করুণ দৃশ্য।

প্রবেশ করলাম কাষ্টমসের খোঁয়াড়ে। 'আমি কি করি', সৎসঙ্গ আমাকে পাঠাচ্ছে কিনা, ইত্যাদি দু'চারটা প্রশ্ন করেই 'পাশ্' করে দিল কর্তব্যরত অফিসার। তবে হাতের ঐ বিরাট বিরাট সুগন্ধী রজনীগন্ধা ফুলের মালাগুলি নিতে দিলেন না। ফুল বা ফল নাকি নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নাই।

এয়ার-এজেন্ট শ্রীমতী দীপালী দত্ত নামে এক ভদ্রমহিলাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁকে যদি অনুগ্রহ ক'রে পথে একটু সাহায্য করেন তবে ভাল হয়।' ভদ্রমহিলার পিতাও অনুরূপ অনুরোধ জানালেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বার বছরের একটি মেয়ে ও আট বছরের একটি ছেলে। লণ্ডনে যাচ্ছেন স্বামীর কাছে। স্বামী ডাক্তার। লণ্ডনেই ঘর বাড়ী করে সেখানেই বাস করেন তিনি। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব' বলতেই ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় দিলেন।

প্লেনে উঠবার ডাক পড়ল। দেখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে চারটা বিরাট-বিরাট হাত-ব্যাগ। প্রত্যেকটা লোহার বোঝার মত ভারি। তাঁর পক্ষে একটির বেশী নেবার উপায় নাই। মেয়েটি সব থেকে ছোট ব্যাগটি হাতে নিল কোনরকমে। অগত্যা আমার বোঝার ওপরে ভদ্রমহিলার 'শাকের আটি' দুটি তুলে নিয়ে কোনমতে উঠলাম যেয়ে প্লেনে।

বোম্বে, কোয়েৎ, জুরিখ, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে খালি হাতে একটু আরাম ক'রে যে বেড়াব তা আর হলো না। অনেক জায়গায় এই ভারী বোঝাগুলি নিয়ে আমাকে নামা-ওঠা করতে হল।

পথে ভারবহন করার কষ্ট হলেও গোটা পথটা কেটেছে বেশ আনন্দেই। লণ্ডন পর্যন্ত নিজের দেশের মাতৃমূর্তি, 'দাদা' 'কাকু' সম্বোধন লণ্ডন পর্যন্ত শুনতে-শুনতে এসেছি। ভদ্রমহিলা একবার মাত্র 'মিঃ বিশ্বাস' ব'লে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু তারপর বার-বার 'দাদা' বলেই ডাকতে লাগলেন। সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশে মধুর 'দাদা' ডাক চিরপরিচিত গৃহকোণের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। যে সকল বিমানবন্দরে প্লেন অধিক সময় দাঁড়াল ও যাত্রীরা নামবার অনুমতি পেল সেই সব বিমানবন্দরে চারজনে মিলে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

লণ্ডন পর্যন্ত কোনরকম মন খারাপ লাগেনি আমার। বরং ভালই লাগছিল প্রকৃতির রং-বেরঙের বিচিত্র শোভা দেখতে। কোয়েৎ থেকে প্লেন যখন ছাড়ল তখন ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা। সূর্যদেব হেসে উঠলেন, দিগন্তরেখার ওপরে। প্রায় চার ঘন্টা আকাশে উড়ে রোম বিমানবন্দরে যখন পৌঁছালাম তখন দেখি সেখানে সবে সকাল সাতটা। রোমের বিমানবন্দর দেখতে তেমন আহা-মরি নয়। ধনীর কার্পেট মোড়া, সাজান-গোছান ড্রইংরুমের পাশে কাঠমুদির দোকানকে যেমন দেখায় ঠিক তেমনই দেখাচ্ছিল। মনে হল দেশটা গরীব নাকি? একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যে এমন নিরাভরণ হতে পারে তা রোম বিমানবন্দর না দেখলে এ যাত্রায় বুঝতে পারতাম না।

রোম থেকে জুরিখ। আল্পস্ পর্বতের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। নীচের দৃশ্য অপূর্ব। গাঢ় সবুজের সমাবেশ। পর্বত-শীর্ষের নগ্ন দেহে মেঘের গুচ্ছ কোথাও বা জমাট বাঁধা বরফের মত দেখাচ্ছে, আবার কোথাও বা সবুজের বুকে সাদার প্রলেপ আল্পস্‌কে অতুলনীয় ক'রে তুলেছে। মনে পড়ে গেল: প্রখ্যাত ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ভাবার প্লেন এই আল্পসের চূড়াতেই ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। আর ফিরে আসেননি ডঃ ভাবা তাঁর মাতৃভূমিতে!

লণ্ডনে ল্যাণ্ড করল প্লেন ভারতীয় সময় বিকাল চারটায়। লণ্ডনের সময় মাত্র সকাল এগারটা।

মিসেস দত্তকে পৌঁছে দিতে হবে লণ্ডন কাষ্টম্‌স্‌-এ। প্রায় দুই ফার্লং দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে পায়ে হেঁটে! সমস্যা হল এই বোঝাগুলি নেব কি করে? দুই হাতে চারটে বোঝা! তারপর এত ভারি। কুলি পাওয়া যায় না। মানুষ তাদের লাগেজ বহন করে কি ক'রে? দেখলাম চাকা লাগান ট্রলি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদূরে। ওগুলি নিলে কেও যদি কিছু বলে? ওগুলি কি যাত্রীদের মালবহন কাজে সাহায্য করার জন্যই রাখা আছে তা কি করে জানব? কোনদিন কি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে মালবহন করার সমস্যায় পড়েছি নাকি? তাছাড়া কেওই তো ওগুলির গায়ে হাত দিল না। সবাই হাত-পা দুলিয়ে জনতার ঢেউএর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে লাউঞ্জের দিকে। অগত্যা সেই পাহাড়প্রমাণ বোঝা নিজের ঘাড়ে ক'রে পৌঁছে দিয়ে এলাম কাষ্টম্‌স্‌ এ। ভদ্রমহিলা নমস্কার জানালেন। বললেন—লণ্ডনে এলে আমাদের বাড়ীতে আসবেন কিন্তু দাদা।

মিসেস্‌ দত্তকে পৌঁছে দিয়ে ট্রানজিট্‌ লাউঞ্জে এসে বসে আছি। বিশ্রাম নিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ চারিদিক থেকে মাইক্রো-ফোনের প্রতিধ্বনিতে বুকের মধ্যে ধড়াক্‌ করে উঠল। চারিদিক থেকে একই আওয়াজ ভেসে আসছে—মিঃ বিশ্বাস, কামিং বাই এয়ার ইণ্ডিয়া···"সচকিত হ'য়ে শুনি—আমার নাম 'আর বিশ্বাস' শব্দটাই বার-বার আছড়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে। কি যে বলতে চাইছে আমাকে, তা' বুঝতে পারলাম না ইংরাজ কণ্ঠের ইংরাজী ভাষা শুনে। পাশের এক ইটালীয় ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বুঝিয়ে বললেন—মিঃ আর বিশ্বাস ইজ রিকোয়েষ্টেড্‌ টু মিট মিসেস্‌ লক্ষ্মী।

সে আবার কে রে বাবা! মিসেস্‌ লক্ষ্মী নামে কাউকে তো কোনদিন জানি না। আর এই সুদূর বিদেশে কেই বা জানে যে আজ আমি আসছি। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম ইনফরমেশন্‌

টেবিলের কাছে। কর্তব্যরত মহিলা বললেন—মিসেস্ লস্মী ওয়ান্টস টু মিট ইউ।

আমি বললাম—আই ডোন্ট নো এনি মিসেস্ লসমী।

আমার মুখের অবস্থা দেখে প্রশ্ন করলেন তম্বী অফিসার—আর ইউ মিঃ বিশ্বাস? আমি বললাম—ইয়েস্! বাট হু ইজ্ মিসেস্ লস্মী?

ভদ্রমহিলা তার পাশে দণ্ডায়মান মিস্ জুলিকে কানে কানে কী যেন বললেন! মিস্ জুলি ছুটে গেলেন অদূরে কর্তব্যরত একজন অফিসারের কাছে। বুঝতে পারলাম মিস্ জুলি ঐ অফিসারের কাছ থেকে আমার বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে এলেন। ভিসা ও অনুমতি না থাকলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের লাউঞ্জের বাইরে কেউ যেতে পারে না—বিশেষ ক'রে কাস্টমস্-এর মাধ্যমে ছাড়া তো কেউই পারে না।

মিস্ জুলিকে অনুসরণ ক'রে ট্রানজিট্ লাউঞ্জের বাইরে আসতে "হ্যালো, মাষ্টারমশাই" ব'লে হাত চেপে ধরল আমার প্রাক্তন ছাত্র নেপাল। প্রবীণ সৎসঙ্গী ৺সতীশচন্দ্র করের কনিষ্ঠ পুত্র নেপাল। আঠার বৎসর আগে সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়ে সে আমার ছাত্র ছিল। এই দীর্ঘ আঠার বছরের মধ্যে আর দেখা নেই তার সঙ্গে। আমি আসছি সংবাদ পেয়ে দেখা করতে ছুটে এসেছে বিমানবন্দরে। নেপালের পেছনে তার পাঞ্জাবী স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী। পরিচয় হ'ল সাহেবী কায়দায়। বুঝলাম বিজয়লক্ষ্মী তার বান্ধবী জুলিকে প্রভাবিত ক'রে আমাকে লাউঞ্জের বাইরে আনবার ব্যবস্থা করেছে। লক্ষ্মীকে পদবী মনে করেই ইংরাজীতে বলেছিল—"মিসেস্ লস্মী" ইত্যাদি!

বেশ গল্পগুজব হ'ল তিনজনে। কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করল নেপাল ও তার স্ত্রী। কোন-কিছুই খাবার ইচ্ছা ছিল না আমার। তাই বুঝিয়ে নিরস্ত করতে হল দু'জনকেই। হঠাৎ নেপাল পাঁচ পাউণ্ড মূল্যের দু'খানা নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—এটা রাখুন মাষ্টারমশাই। বিদেশে কাজে লাগবে। বিশেষ কিছুই করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম ছাত্রের এই শ্রদ্ধার দান। মনে-মনে গর্ব হ'ল ওর জন্য। পরমপিতার অহেতুক দয়া বলে মনে হ'ল। পকেটে তো মাত্র আট ডলার সম্বল। বিমানবন্দর থেকে ডঃ কোলের বাড়ী যেতে কত লাগবে কে জানে?

প্লেন ছাড়ার সময় হ'ল। ওদের দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলাম। প্লেন আকাশে উড়ল।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ প্লেনের ঝাঁকিতে চেয়ে দেখি মহা-সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। এয়ার হোস্ট তখন দেখাচ্ছেন (বোধহয় দ্বিতীয় বার) কেমন ক'রে লাইফ বেল্ট ও অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বাতাসের চাপ হঠাৎ পরিবর্তিত হওয়ায় দু'বার বাম্পিং (Bumping) হ'ল প্লেনে! যাত্রীদের পেটের সঙ্গে সীট বেল্ট বাঁধবার জন্য বার-বার অনুরোধ এল অধিনায়কের তরফ থেকে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সকল যাত্রীর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আশঙ্কার ছাপ।

মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হ'য়ে গেল। কোথায় চলেছি। চৌদ্দহাজার মাইল দূরে! যদি বাবা, মা বা আর কারও অসুখ হয় ফিরব কেমন করে? ফেরার টিকিট তো নাই আমার কাছে! ফিরতে গেলেই লাগবে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা। ওরে বাবা! কোথায় পাব এত টাকা? যাচ্ছি-ই বা কোথায়? কাউকে তো চিনি না সেখানে! ডঃ কোল্—যিনি স্পন্সর (Sponsor) করেছেন আমাকে, তাঁকে আশ্রমে দেখেছি বছর দশ আগে। তাঁর চেহারা তো মনে পড়ছে না আমার। তাঁরও কি মনে আছে হাজার-হাজার আশ্রমবাসীর সঙ্গে দেখা আমার চেহারা? যদি চিনতে না পারেন আমাকে? বিমানবন্দরে আসতে না পারেন যদি? যাচ্ছি কেন আমেরিকায়? নানা চিন্তায় অবসন্ন হয়ে এল শরীর মন! বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে বার বার। কয়েকবার চোখ মুছে ফেললাম সহযাত্রীদের অজান্তে। প্রাণপণে "নাম" করছি আর "নামী"-র শ্রীচরণে প্রার্থনা করছি—'দয়াল তোমার যা' ইচ্ছা তাই হোক'।

এমন সময় এয়ার-হোষ্টেস্ (air-hostess) এক ভারতীয় মহিলা এসে আমার সীটের সামনের ডাইনীং টেবিলটা খুলে দিল। একটু মিষ্টি আপ্যায়নার হাসি হেসে বলল—"লাঞ্চ"।

সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন মহিলা এসে হাজির। সামনের ঐ টেবিল-এ রাখল বিরাট এক ট্রে। তাতে সাজান আছে ভাত, পুরি, ফুলকপির ডাল্‌না, মটরশুঁটির তরকারি, পাঁপড় ভাজা, কাগজের মোড়কে চাট্‌নী, ক্ষীর, দৈ, বিস্কুট, মাখন, সন্দেশ ও হলুদ রঙ-এর কমলাভোগের মত কী একটা মিষ্টি। মিষ্টিটা দেখে লোভ যে হল না তা নয়, ভাবলাম সবশেষে মিষ্টিটা 'রসে-বশে' খাওয়া যাবে। কিন্তু খেতে যেয়ে দেখি ওটা মিষ্টি নয়। চিনির রসে ডোবান পাকা পীচফল।

নিজের দুর্বলতার কথা বলতে লজ্জা কি? যখন খুব বেশী মন খারাপ হয়, তখন ভাল খাবার পেলে, খেয়ে একটা টানা ঘুম দিতে পারলে মন আবার সতেজ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভাত-পেটুক মানুষের সামনে এই ৩৩ হাজার ফুট মহাশূন্যে ভাত-তরকারি হাজির হলে মনের ভাব যে কেমন হয় তা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি অনুভব করলাম মর্মে-মর্মে। খাওয়া সেরে সটান শুয়ে পড়লাম। হতাশায় বিষণ্ণ মনের ওপরে নিদ্রার প্রলেপ লাগতে বেশী দেরী হল না।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখি নিউইয়র্ক শহরের ওপরে উড়ছি। যাত্রীদের প্রস্তুত হতে বলা হচ্ছে: "We are approaching J. F. Kenedy Airport in New York", নিউয়র্কের সময় এখন তিনটে বেজে দশ মিনিট! বাইরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট!

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সারা শহরটা দেশলাই-এর বাক্সে ঢাকা। আর একটু নীচে নামতেই বুঝতে পারলাম যে শহরের সমস্ত রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মোটরকার পার্ক করা আছে। দূর থেকে ঐগুলিকে দেশলাই-এর বাক্স ব'লে মনে হচ্ছিল। আর

একটু নীচে নামতেই দেখলাম দাঁড়ান নিশ্চল গাড়ীর দুই সারির মাঝখান-দিয়ে পিলপিল করে এগিয়ে চলেছে অসংখ্য চলন্ত গাড়ী। অবাক হয়ে ভাবলাম এত পিঁপড়েও একসঙ্গে দেখি নাই কোনদিন।

৩-১৫ মিনিটে অবতরণ করলাম প্রখ্যাত কেনেডি বিমানবন্দরে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জন ফষ্টার কেনেডির নামানুসারে নূতন নামকরণ হয়েছে এই বিমানবন্দরের। এখানে প্রতি মিনিটে একখানা বিমান আকাশে ওড়ে আর পরবর্তী মিনিটে আর একখানা অবতরণ করে।

কাস্টমস্, ইমিগ্রেশন (immigration', হেলথ্ প্রভৃতি বিভাগ অতিক্রম ক'রে তাদের আইনের বেড়াজাল ভেদ ক'রে যখন বাইরে এলাম তখন স্থানায় সময় বেলা পাঁচটা

যাত্রীদের ওয়েটিং হলে অপেক্ষা করছি। এখান থেকে যেতে হবে এদের ন্যাশানাল বিমানবন্দর লাগাডিয়াতে। সেখান থেকে অন্য প্লেন ধরে ওয়াশিংটনে যাব।

এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি দেওঘরের ডেগলাল ভাই বিরাট জনতার পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে বার বার কাউকে দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হল সে হয়তো আমার জন্যই অপেক্ষা করছে বেলা তিনটা থেকে। চিঠি দিয়েছিলাম আজ এই প্লেনে আসব বলে। কিন্তু সে যে চারশ মাইল দূরবর্তী আর-একটা শহর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তা ভাবতেও পারিনি। পেছন থেকে "জয়গুরু" বলে জড়িয়ে ধরলাম ডেগলাল ভাইকে। সেও জড়িয়ে ধরল আমাকে। সুদূর বিদেশে সহস্র অচেনা মানুষের মাঝে দেশের একটা মানুষকে যে কত মিষ্টি লাগে তা আজ মর্মে-মর্মে অনুভব করলাম। বুকে যেন বিরাট আশার সঞ্চার হল ডেগলাল ভাইকে দেখে।

নানা গল্প করতে করতে এয়ার লাইনস্-এর বাসে এলাম লাগাডিয়া বিমানবন্দরে। ডেগলাল ভাই তার নানা সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূরণ করার জন্য

বহু ক্লেশ স্বীকার করে বেশ কিছুদিন আগেই এসেছে আমেরিকায়। গুরুভ্রাতা লুটম্যানদা তাকে অনেক সাহায্য করেছেন ব'লে জানাল। তবে আর সেখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানাল। তার কথা শুনে মনটা বড় খারাপ লাগল। তার জন্য যদি কিছু করতে পারতাম সেই মুহূর্তে তাহলে তৃপ্তি পেতাম। আমার পকেটের ওজন তো মাত্র কয়েকটি ডলার। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তা কিছুই জানি না। যাহোক তার অনুরোধ ক্রমে স্পেন্সারদার ঠিকানা তাকে জানাব বলে বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে। সিকিউরিটি কেন্সিং-এ প্রবেশ করলাম আমি। ডেগলাল ভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার যাত্রাপথে। মনে হল নিতান্ত আপনজনকে বিদায় দিয়ে কষ্ট পাচ্ছে অন্তরে।

নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ৫-৪০ মিনিটে প্লেন হ্যাঙ্গার ত্যাগ করল। এগিয়ে চলল রানওয়ে ধরে। কিন্তু কি কারণে জানি না, ফ্লাই করল ৬-১৫ মিনিটে।

আবার খাবার নিয়ে এল এয়ার-হোষ্টেস্। আমার ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি আমার যাত্রার সময় থেকে ৩৩ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। কোয়েতে যখন সূর্য উঠেছিল তখন একবার ইষ্টভৃতি করেছিলাম, তারপর ২৭ ঘন্টা পার হ'য়ে গেছে। অথচ চোখের সামনে ঐ একই সূর্য এখনও জ্বল জ্বল করছে। ঘড়ির নির্দেশানুযায়ী সূর্য অস্ত যেয়ে আবার পূর্ব দিগন্তে উদিত হবার সময় পার হয়ে গেছে। আমরা সূর্যের আগে আগে উড়ে এসেছি বলে সূর্য আমাদের কাছে অস্ত যাবার সময় পায় নাই। তাই আর একবার ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী নিবেদন করলাম আমার ইষ্টের চরণে।

৭টায় নামলাম ওয়াশিংটন বিমানবন্দরে। গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছি বিরাট স্যুটকেশ হাতে নিয়ে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক একটু সামনে এগিয়ে এসে বললেন,—'Are you Mr. Biswas?' 'Yes' বলতেই আমার হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে নিলেন তাঁর বাম হাতে। ডান হাত দিয়ে আমায় করমর্দন ক'রে বললেন—

am Robert Kole, she is Mrs. Kole, and this is my daughter Miss Cathy Kole. সকলের সঙ্গে করমর্দন ও প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় হল।

ডঃ কোলকে দেখে, তাঁর আন্তরিক আপ্যায়নার স্পর্শ পেয়ে বুকখানা ভরে উঠল।

ডঃ কোল নিজেই স্যুটকেশটা নিয়ে তাঁর গাড়ীতে উঠলেন। আমরা সকলে গিয়ে বসলাম গাড়ীতে। ৭-৩০ মিনিটে তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে এসে পৌছালাম। ডঃ কোল সঙ্গে-সঙ্গে কেবল্ করলেন শ্রীশ্রীবড়দার কাছে—"রেবতী অ্যারাইভড্ সেফ্লি।"

চারজনে একসঙ্গে বসলাম ডিনার টেব্‌লে। আমাকে বিমান-বন্দরে আনতে যাবার জন্য এঁদের সময়মত ডিনার খাওয়া হয়নি বুঝতে পারলাম। মিসেস কোল আমার জন্য একটু 'রাইস্,' 'আলুসিদ্ধ' ও 'মটরশুঁটী সিদ্ধ' রেখেছেন। তার সঙ্গে আছে পাউরুটী, মাখন, জেলী, সালাড্ প্রভৃতি। আহারাদি সেরে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত চলল শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা-কীর্তন। এরপরে good night-এর পালা শেষ ক'রে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলাম।

ওয়াশিংটনের সকাল। ঘুম থেকে উঠেছি স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটায়। অবশ্য ঘুম থেকে উঠেছি বললে যথার্থ কথা বলা হবে না। কারণ, সারারাত একটুও ঘুমাতে পারিনি। মানসিক উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা যে ছিল তা নয়।

যে বিছানা নির্দিষ্ট ছিল আমার জন্য, তাই বাধ সাধল ঘুমোবার পথে। আধুনিক পালঙ্কের ওপরে পনের ইঞ্চি চাওড়া যে তোষক দু'খানা ছিল তা এত কোমল যে তার ওপরে বসতেই কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। শোয়ামাত্র সুষুম্না নাড়ী বেঁকে গেল ধনুকের মত। বালিশও তদ্রূপ। দেখতে "পেট ফোলা গোবিন্দের" মত। কিন্তু তার ওপরে মাথা রাখলেই চুপসে হয়ে যায় হাওয়া শূন্য ফানুসের মত।

মেরুদণ্ড সোজা ক'রে ঘুমান অভ্যাস। তাই শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলাম না এই বিছানায়। অবশেষে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানেও পাঁচ ইঞ্চি পুরু কার্পেটের দৌরাত্ম।

রাত্রে ঘুম না হবার দ্বিতীয় কারণ ধরা পড়ল আরও কদিন পারে। প্রত্যেক মানুষের শরীর-বিধানের মধ্যে যে ঘড়ি আছে তার অভ্যস্থ তাল যদি বেতাল হয়ে যায় তাহলে ঘুমানো মুশকিল হয়ে পড়ে তার পক্ষে। ভৌগোলিক পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে শরীর-বিধানে যে এমন তোলপাড় শুরু হয় তা তো আগে জানা ছিল না।

ভারতবর্ষ থেকে নিউইয়র্কের দ্রাঘিমাংশের যে পার্থক্য তাতে সময়ের পার্থক্য হয় এগার ঘন্টারও বেশী। ভারতে আমরা যেখানে বাস করি সেখান থেকে একটা লম্বা শলাকা যদি পৃথিবীর পেটের মধ্যে দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে বের করে দেয়া যায় তাহলে শলাকাটা যেখান দিয়ে ফুঁড়ে বেরুবে ঠিক সেখানে আমেরিকা। আমরা যেখানে থাকি ঠিক তার নীচে অর্থাৎ পৌরাণিক ভাষায় পাতালপুরীতে আমেরিকার অবস্থান। তাই এখানে ডঃ কোলের বাড়ীতে যখন শোবার সময় হয় অর্থাৎ রাত্রি ১১টা বাজে তখন আমার বাড়ীতে যে সেই দিনের বেলা বারটা। তখন কি ঘুমোবার সময়? তখন সবাই ছুটোছুটি করছে অফিস, আদালত, কারখানা। তাই ঘুমোবার চেষ্টা করলে কি হবে। আমার শরীর বিধানের ঘড়ির কাঁটায় যে তখন মধ্যাহ্ন বারটা বেজে আছে। ঘুম আসবে কেন? আবার ভারতে যখন ঘুমোবার সময় হয় অর্থাৎ রাত্রি দশ কি এগারটা বাজে তখন এখানে যে বেলা ন'টা কি দশটা বাজে। পুরোদমে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় সারা শহরের বুকের ওপরে। তাই সকলে যখন বুক ফুলিয়ে কাজে যায় আমার সমস্ত শরীর তখন ভেঙ্গে পড়ে ঘুমের চাপে। সারারাত জেগে যাত্রাগান শুনলে ভোরবেলায় শরীরের যে অবস্থা হয় ঠিক তেমন মনে হতে থাকে বেলা

৯টার পর থেকে। সে এক অসহ্য অস্বস্তি। বেশ কিছুদিন লাগল নূতন পরিবেশে ঘুমোবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে।

স্থান-সময়ের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে তাল দিতেও বেশ বেগ পেতে হল ক'দিন ধরে। এখানে যখন সন্ধ্যা তখন এদের ঘড়িতে স্থানীয় সময় ৯টা আর যখন ভোর হয় তখন সাড়ে পাঁচটা। অবশ্য উষাকাল চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। ঘুম থেকে উঠে একটু যে প্রকৃতির কোলে বেড়াব তারও উপায় নেই।

গোটা বাড়ীটা এয়ারকণ্ডিসান করা। সদর দরজায় তালা বন্ধ। দিন-রাত সর্বদাই তালা বন্ধ থাকে সদর দরজায়। যখন বাইরে যেতে হয় তখন তালা খুলে বাইরে গিয়ে আবার তালা বন্ধ করতে হয়। কোলদম্পতি উঠবেন সাড়ে সাতটায়। তার আগে বাইরে বেরুবার উপায় নেই। তালা বন্ধ করে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে এই এলাকায় "কালা আদমীর" বাস বেশী। তারা যে কখন কি মূর্তি ধারণ করে সাদা চামড়ার লোকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। তাই এই সাবধানতা।

এঁরা যখন ডিনার করেন তখন ঘড়িতে বাজে ৭টা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে খেয়ে রাত্রি এগারটায় শুতে গেলে ঘুম যেটুকু আসত তাও বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আমার চিরকালের অভ্যাস রাত্রের আহারের পর শুয়ে পড়া। তাছাড়া সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে সামান্য টিফিনের অভ্যাস। অথচ এঁদের কাছে ডিনারই হচ্ছে সারাদিনের মধ্যে ভারী ভোজ। রাত্রে শোবার সময় এরা স্ন্যাক্ গ্রহণ করেন। দুধ, সাওয়ার ক্রীম, ফলের রস, অথবা আইসক্রীম বা কৌটায় সংরক্ষিত কোন হাল্কা খাবার প্রভৃতির যে-কোন একটা গলাধঃকরণ করে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেন!

মিসেস্ কোলের আপ্যায়নের অন্ত নেই। বুঝতে পেরেছেন আমি এঁদের অভ্যস্ত খাবারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না। জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছেন আমি ভাত পছন্দ করি। দুপুরে লাঞ্চ ও সন্ধ্যায় ডিনারের সময় তাই ভাতই দেন আমাকে। তেলমাখা বাটি

অপেক্ষা একটু বড় বাটিতে ঝরঝরে ভাত। তার বুকে চক্‌চকে একখানা কাঁটা চামচ গাঁথা। আর একটা প্লেটে বরবটির বাচি ও মটরশুঁটী, কখনও বা ফুলকপি বা দু'টুকরো গাজর সিদ্ধ। সঙ্গে থাকে মাখন, লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়ো। সবগুলি মিলিয়ে গলাধঃকরণ করলেও পেটের এক কোণে পড়ে থাকে। বিরাট পাকস্থলীর বাকী অংশ ভরে কেলি সাদা জল দিয়ে। যখন যা' প্রয়োজন তা' চাইবার জন্য স্ট্যাণ্ডিং অনুরোধ ক'রে রেখেছেন মিসেস্ কোল্। তবুও লজ্জা করে চাইতে। আমার যে কমপক্ষে ১০০ গ্রাম চালের ভাত লাগে তা বুঝাই কি ক'রে? আর বলিই বা কি ক'রে যে থালায় ভাত চট্‌কে ডাল-তরকারি ইত্যাদি দিয়ে মেখে মুখের স্বাদে খাওয়া অভ্যাস। ভিটামিন, প্রোটীন যুক্ত সিদ্ধ খাদ্যের ব্যবহারে সিদ্ধ হয়ে উঠিনি জীবনে। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি। পরমপিতাকে স্মরণ করি।

তৃতীয় দিনে যে সমস্যার সম্মুখীন হলাম তা খাদ্য সমস্যার চাইতেও ভয়ঙ্কর ও হতাশাব্যঞ্জক। বিষয়টা গুরুতর অপেক্ষাও জটিল। কলকাতার কনস্যুলেট অফিস আমাকে ৬ মাসের ভিসা মঞ্জুর করেছিল। এই ছয় মাসের মধ্যে আমি তিনবার যাতায়াত করতে পারি আমেরিকায়। শ্রীশ্রীবড়দা শুনে বললেন—এত কাঠখড়ি পুড়িয়ে খরচাপত্র ক'রে মাত্র ছয় মাসের জন্য সেখানে যেয়ে কি করবি? ছ'মাস তো দেখতে-দেখতেই চলে যাবে।

সত্যই তো! ছ'মাসে কা কাজ করব সেখানে? আবার এতদূর অগ্রসর হয়ে যাওয়া বন্ধই বা করি কোন্‌ মুখে?

ডঃ কোল্‌কে বিস্তং ক'রে লিখে জানালাম। তিনি সমাধান পাঠালেন। লিখলেন—'এখানে এসে যদি কোন কাজ জোগাড় করা যায় তাহলে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। দু'তিন বৎসরের জন্য অসুবিধা হবে না। আর যে-কোন কাজ এখানে হামেশাই পাওয়া যায়। ট্রাভেলিং এজেন্টও একই মর্মে সংবাদ জানালেন।

শ্রীশ্রীবড়দা শুনে বললেন—'তা হ'লে তো ভালই।' একটু

চুপ ক'রে থেকে বললেন—'দেখ, আর কিছু না হোক একটা experience (অভিজ্ঞতা) তো হবে।'

ডঃ কোল্ সংবাদ নিয়ে যা জানালেন তাতে সব আশাই চুপসে গেল। বললেন—কাজ পেলে টুরিষ্ট ভিসা পরিবর্তন ক'রে অন্য ভিসা পাওয়া যায় ও বেশীদিন থাকা যায়. কিন্তু সাদাবাজারে কোন কাজ করতে গেলেই এম্প্লয়ার (employer) ওয়ার্কস্ পারমিট (কাজের অনুমতিপত্র) চেয়ে বসে। বিনা ওয়ার্কস্ পারমিটে কেউ কোন কাজ দেবে না। আর কোন টুরিষ্টের পক্ষে সরকারের ইমিগ্রেশান বিভাগ থেকে ওয়ার্কস্ পারমিট পাবার কোন অধিকার নেই।

অগত্যা ডঃ কোল্ নিজেই তাঁর মেয়ের প্রাইভেট টিউটর হিসাবে ও অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত করেছেন এই মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করে উপযুক্ত ফী সহ ইমিগ্রেশান বিভাগে জমা দিলেন। ইমিগ্রেশান থেকে তুরন্ত জবাব এল : এদেশের কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ সেই কাজের জন্যই কোন বিদেশীকে "স্পন্সর" করতে পারেন যে কাজ করার উপযুক্ত লোক এদেশে নেই বা যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং আমার ভিসা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে এদেশে থাকবার আশা বিলীন হয়ে গেল। ডঃ কোল্ দুঃখ ক'রে বললেন, আমি নিজে ইমিগ্রেশান বিভাগে খোঁজ নিয়ে যদি জানতাম তাহলে এইরকম একটা ভুল সংবাদ দিয়ে তোমাকে বিব্রত করতাম না। আমার বন্ধুরা আমাকে ভুল সংবাদ দিয়েছিল। আমি প্রকৃতই দুঃখিত তোমার জন্য।

কনস্যুলেট অফিস ভারতবর্ষ ছেড়ে আসার আগে ভিসার ওপরে যে সময়ের মেয়াদ উল্লেখ ক'রে দেয় একজন "টুরিষ্ট" সেই মেয়াদের মধ্যে তিনবার যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু কেনে বিমানবন্দরে নামলে, বিমানবন্দরে অবস্থির ইমিগ্রেশান বিভাগ যে সময় পর্যন্ত থাকবার অনুমতি "ষ্ট্যাম্প" দিয়ে দেয় তার বেশী সময় এদেশে থাকবার অধিকার কারও নাই। আমার ভিসার ওপরে তিন মাসের জন্য অনুমতি মিলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে উপযুক্ত ও সন্তোষজনক

কারণ দেখিয়ে সরকারের ইমিগ্রেশান বিভাগে আবেদন করলে প্রতি-বারে একমাস ক'রে থাকবার মেয়াদ তিনবার পর্যন্ত পরিবর্দ্ধন করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে প্রথমবার আবেদন করতেই "পরিবর্দ্ধিত" সময়ের পাশে "ফাইনাল" কথার ছাপ মিলে যায় তা পরবর্ত্তীকালে দেখেছি।

শেষ পর্যন্ত মনকে প্রবোধ দিয়ে স্থির করা হল যে কয়মাস (সর্বাধিক ছয় মাস) থাকা সম্ভব হবে তার মধ্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে বেশী সংখ্যক লোকের সান্নিধ্যে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় জানাতে পারি। কিন্তু কার সান্নিধ্যে যাব! এখানে কারও বাড়ীতে তো কেউ যায় না। নিতান্ত পরিচিত হলে আগে থেকে ফোন ক'রে "অ্যাপয়েন্টমেন্ট" করে তবে যেতে হয়। তাছাড়া এই এলাকায় বেশীর ভাগই নিগ্রোদের বাস। শ্বেতাঙ্গ যারা আছেন তারা "ব্রেকফাষ্ট" সেরেই চলে যান অফিস্, আদালত বা কারখানায়। বাড়ী বা বাসায় ফেরেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। তারপর গৃহবন্দী বা ক্লাবে বা বলরুমে মদিরা বা বান্ধবী নিয়ে হেভিলি এনগেজ্‌ড্। শনি ও রবিবার ছুটির দিন। শহর শূন্য ক'রে সবাই চলে যান দূরদূরান্তে— 'উইক এণ্ড' করতে। সুতরাং এদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সম্ভাবনা কম।

রাস্তায় বেরিয়ে পথচারীদের সঙ্গে যে আলাপ জমাব তারও তো উপায় নেই। কারণ, রাস্তায় তো লোক দেখি না। তৈলধারার মত অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে রং-বেরংএর গাড়ী। মনে হচ্ছে সুদূর কোন্ পর্বতকন্দরে বাঁধভাঙ্গা সরোবরের স্রোতধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ীর বীচিমালার আকারে। 'চেভোরলেট্,' 'বিউইক্', 'ক্যাডিলাক,' 'রোলস্ রয়েজ', প্রভৃতি বড়-বড় গাড়ীর ফাঁকে-ফাঁকে জাপানী টয়ওটা, সুইডিস্ ইকনমিককার, জার্মানীর ভকস্‌ওয়াগন, ইটালীর ফিয়েট প্রভৃতি ছোট গাড়ীও দমবন্ধ করে ছুটে চলেছে আপন-আপন গন্তব্যস্থলে। কদাচিৎ দুই-একটা লোকের মুখ দেখি বটে কিন্তু তাদের মুখোমুখি হবার আগেই হুস্ উঠে যায়

নিজেদের 'অ্যাপার্টমেন্টে (ঘরে) অথবা ঢুকে পড়ে ফুটপাথের ধারে অপেক্ষমান মোটর কারে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের আড়ালে। বুঝতে পারি এরা সওদা করতে এসেছিল নিকটবর্তী "ডেলিকেটেসেন্স" বা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে।

ডঃ কোল্ পরামর্শ দিলেন: অফিসে যাবার আগে আপনাকে "ডুপন্ট সার্কেলে" নিয়ে যাব; ডুপন্ট সার্কেল হচ্ছে ওয়াশিংটনের শহরের সবচাইতে বড় পার্ক। আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দেবেন। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করব। দু'-চার জন মানুষ আমাদের আলোচনায় আকৃষ্ট হ'য়ে জমা হলে আপনাকে রেখে আমি অফিসে চলে যাব।

কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ শুরু হ'য়ে গেল। পরদিন থেকে যেতে শুরু করলাম ডুপন্ট সার্কেলে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এমন লোক কই? ছোট-ছোট শিশুরা খেলা করছে এদিকে-ওদিকে। তাদের অদূরে মাইনে-করা আয়া ঝিমুনি খেতে-খেতে তদারক করছে ঐ শিশুদের। বৃদ্ধ যারা বসে আছে, তাদের কেউ বা ধ্যানস্থ হ'য়ে আছে মদের নেশায়। কেউ বা নখ দন্ত-গলিত ব্যাঘ্রের মত উদাস নয়নে চেয়ে আছে পথচারী পোষা কুকুর বা বক বক্ কুম্, বক বক্ কুম্ কারী পায়রাদের দিকে। ডঃ কোলের কাছে জানলাম এদের অধিকাংশই হোমো। বাকী যারা আছে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে ব্যর্থতার ছাপ। এদের দেখে মনে হয় এরা অনন্ত চাহিদার দুস্তর প্রান্তর পার হ'য়ে এসে দিক্‌হারা হ'য়ে পড়েছে। এখন এরা কি যে চায় তা নিজেরাই জানে না।

আর যারা আছে তারা বয়সে তরুণ বা তরুণী হলেও চেহারায় ছন্নছাড়া। ছেঁড়া, শত পট্টিমারা প্যান্ট পরণে, কেও বা খালি গায়ে, আলুথালু বেশ, অর্ধআবৃত একটি বা দুইটি বান্ধবী বগলে ক'রে ভবঘুরে বেদুইনের মত পড়ে আছে ঘাসের ওপরে। এদের সাজ-সজ্জা, বেশ-বিন্যাস এবং রুচি দেখে মনে হয় না যে এরা পৃথিবীর সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনলজীতে উন্নত একটা সুসভ্য দেশের নাগরিক। এদের

সঙ্গে আলাপ ক'রে অবশ্য ধারণাটা একটু বদলাল। কথাবার্তায় ভদ্র, ব্যবহারে মিষ্টি, মনোভাবে উদার, আপ্যায়নায় অকৃপণ, ভালবাসা বিলাতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এদের হৃদয়টা শূন্য। অর্থ, সম্পদ, গাড়ী, বাড়ী—সব থেকেও কি যেন নেই এদের। কিছু পেতে চায় এরা। কিন্তু কী যে চায় তা' নিজেরাও জানে না। ধরিয়ে দিলেও মেনে নেবার মত স্থৈর্য নেই মনের।

"সেক্স্" সম্বন্ধে এরা খুবই উদার মনোভাবাপন্ন। যৌন-জীবনেও যে রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে তা এরা বুঝতেই চায় না। 'সেক্স্টা' এদের কাছে 'গেম' বিশেষ। বিভিন্ন খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলাধুলা করতে স্পোর্টস্ম্যান স্পিরিট তখানি অপরিহার্য সম-বিপরীত সহচর বা সহচরীর সঙ্গে 'সেক্স-রিলেশন' স্থাপনের ক্ষেত্রে 'মরালিটি' বা 'চেষ্টিটি' কথাটা ততখানি নিষ্প্রয়োজন।

এদের দু'-চারজনের সঙ্গে আলাপ হল। মিঃ জেরী ও মিসেস্ জেরী নামে দু'জন যুবক-যুবতী তাদের ডেরায় আমন্ত্রণ করল আমাকে।

পরদিন এদের আবাসস্থলে যেয়ে হাজির হলাম। তিনতলায় এদের ঘরে প্রবেশের পথে এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারলাম যে ওটা নাকি হিপিদের আড্ডাখানা। ওপরে উঠে গেলাম। ঘরে প্রবেশ ক'রে যা দেখলাম তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাকাবার স্পৃহা উড়ে গেল। বার জন যুবক ছেলে ও সম সংখ্যক যুবতী মেয়ে। গোটা ছয় বেহালা এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ছড়ান। ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট ও শার্ট বিক্ষিপ্তভাবে ঝুলছে ক্লজিট নামধেয় কাঠের খোপে। কিছু কাঁচের বাসনপত্র এদিক-ওদিকে পড়ে আছে। ছোট কল্কে দু-চারটে যে দেখলাম না তা' নয়। আমাদের কাছে পিতা-মাতার আশিস্ যেমন আদরণীয় এদের কাছে 'হাশিস্' (গাঁজার আর এক নাম) নাকি তেমনই। এক পাত্র থেকে সাত-আট জন ছেলেমেয়ে একটা চামচ দিয়েই আইস্ক্রীম জাতীয় কি একটা জিনিস খাচ্ছে। 'উচ্ছিষ্ট' বলে কিছু নেই এদের কাছে। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট একদল যুবক-

যুবতীর সমাবেশে যেয়ে দেখেছিলাম তারা একই পাত্র থেকে একই চামচ দিয়ে দৈ তুলে নিয়ে চেটে খেয়ে যাচ্ছে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে।

যাহোক, প্রায় আড়াই ঘণ্টা আলাপ হল এদের সঙ্গে। আমার আমেরিকায় আসবার উদ্দেশ্য কী, শ্রীশ্রীঠাকুর কেন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। তাঁর "ডক্‌ট্রীনস অফ রিলিজিয়ন (ধর্মমত) গ্রহণ করে কত মানুষের জীবন সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে—ইত্যাদি বিষয় খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল সকলে। তবে আলাপ-আলোচনা কালে কয়েক জোড়া যুবক-যুবতী যেভাবে শক্ত ধরে বসে রইল আমার সামনে, তাতে আমার অনভ্যস্ত চোখে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পরবর্তীকালে ট্রেনে, রাস্তায়, স্কুল করিডরে, পার্কে, সমুদ্রসৈকতে এমন ধরণের সহস্র-সহস্র শক্তশোভা দেখতে-দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। বুঝেছিলাম এটা এদের কাছে অশোভন নয়। অবশ্য প্রাচীন বর্ষীয়সী মহিলা মিসেস্ লুইকে আপশোস ক'রে বলতে শুনেছি, মিঃ বিশ্বাস এদের এই আদেকলেপনা দেখে আমাদেরই লজ্জা করে। আমাদের সময় এ রকমটা ছিল না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সম্মানজনক (honourable) দূরত্ব বজায় রেখেই মেলামেশা করতাম আমরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই ছেলে-মেয়েদের এই অবাধ ও অশোভন মেলামেশাটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

এদের মনের উদারতায় এদের প্রতি সশ্রদ্ধ না হয়ে পারলাম না। এরা বার-বার বলল যদি কোথাও থাকবার জায়গা না পাও, আমাদের এখানে এসে থাকতে পার। তোমার খরচার জন্য ভাবতে হবে না।

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইণ্ড অফার" ব'লে বিদায় নিলাম এদের কাছ থেকে। দুজনে আগামীকাল দীক্ষা নেবে ব'লে কথা দিল।

পরের দিন সকালে মিঃ জেরী ও মিসেস্ জেরী ডঃ কোলের বাড়ীতে এসে দীক্ষা নিল। আমেরিকার বুকে আমার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দু'জন যজমান হওয়ায় বেশ একটু প্রেরণা পেলাম। ডঃ কোল্ অবশ্য বলেন—এ-ধরণের দীক্ষার তেমন বিশেষ মূল্য নেই। এরা প্রকৃতই ভবঘুরে। আজ এখানে আছে, কালই হয়তো চলে যাবে

অন্যত্র। আজ দীক্ষা নিল। যথা নিয়মে, কালই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বলবে, এটা করার কোন প্রয়োজন মনে করছি না।

সত্যই তাই হল। এদের দেয়া নিউইয়র্কে ঠিকানায় বার-বার খোঁজ করেও আর কোনদিন দেখা পাইনি এদের।

ধুতি-পাঞ্জাবী পরে প্রত্যেকদিন বেলা দশটা নাগাদ "ডুপন্ট সার্কেলে" যেয়ে বসে থাকি। 'নাম' করি আর মনে-মনে প্রার্থনা করি: দয়াল তুমি দয়া ক'রে বলে দাও কিভাবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমার জীবনে।

পোশাকে ভারতীয় দেখে কয়েকজন ভারতীয় এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। মিঃ ও, এম দীপক নামে একজন মহিশূরী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোক ভারতীয় দূতাবাসে চাকুরী করেন। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে বললেন, তুমি যদি কোন-রকমে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অফিসে (Indian Embasy) চাকুরী জোগাড় করতে পার তাহলে আমেরিকান সরকারের ওয়ার্কস্ পারমিট ছাড়াই কাজ করতে পারবে। যতদিন চাকুরী থাকবে ততদিন এদেশে থেকে তোমার ঠাকুরের মহিমা প্রচারের চেষ্টা করতে পারবে। ভিসার কোন সমস্যাই থাকবে না।

মিঃ দীপক যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ব'লে আশ্বাস দিয়ে তখনই আমায় নিয়ে গেলেন ভারতীয় দূতাবাসে। তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের সকলের স্বল্প আপ্যায়না এড়াতে না পেরে 'লাঞ্চ' করতে হল তাঁদের সঙ্গে ব'সে।

দুই-তিন দিন ঘোরাঘুরির পর জানা গেল যে বর্তমানে দূতাবাসে কোন ভ্যাকেন্সী নেই। তবে একটা বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল। দূতাবাসে ফার্ষ্ট সেক্রেটারী (co-ordination) মিঃ গ্রোভারের বাসায় একজন লোক প্রয়োজন! রান্না করতে হবে। বিশেষ ক'রে ঘরদোর পরিষ্কার করা, পায়খানা সাফ করা, বাগানের ফুলগাছে জল দেয়া ইত্যাদি সবকাজই করতে হবে। খাওয়া-পরা ছাড়াও মাসে ২৫ ডলার দেবেন হাত খরচা। মিঃ গ্রোভারের সঙ্গে

কথা হল। তিনি মোটামুটি পাকা কথা দিলেন। তবে তাঁর স্ত্রীর কাছে একটু শুনে নিয়ে ফাইনাল কথা দেবেন ব'লে জানালেন।

মিঃ দীপক খুব খুশি হলেন। বললেন—মিঃ গ্রোভারের বাসাতে যদি ঢুকতে পার তাহলে তোমার ভিসার সমাধান হয়ে যাবেই। কারণ ৬ মাস পরেই ভারতে ফিরে যাবেন। তিনি লোক ভাল। যাবার আগে দূতবাসের কোন পদে নিযুক্ত করে ভিসা পরিবর্তন করে দিয়ে যাবেনই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ফিরে চলেছি ডঃ কোলের বাড়ীতে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি কৈ? মনের মধ্যে উঁকি মারছে নানা দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্ব।

শেষ পর্যন্ত পরের বাড়ীর রান্না ও ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ করতে হবে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে! না করেই বা উপায় কি? ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই তো ভারতে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাব কোন্ মুখে? পরম দয়াল ঠাকুরের সেই কণ্ঠস্বর যে প্রতি-নিয়তই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার কানের কাছে—যা শালার! থিসিস্ যেখানে গেছে সেখানে যা! আমেরিকায় যা!···সমস্ত এক্সেট্রার্ণ গ্র্যান্ড······চাই। কেও জানেনা সে-কথা। একমাত্র যাঁর কাছে সবকথা বলে আশ্রয় পাওয়া যায় সেই শ্রীশ্রীবড়দাকে একান্তে জানিয়েছিলাম কথাগুলি। তিনি আমার প্রতি কিছু আশা করেছেন কিনা জানি না কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে গেলে প্রাণে যদি ব্যথা পান তিনি? তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের কামনা—আমরা প্রতি প্রত্যেকে যেন ইষ্ট নির্দেশ পরিপালনের মাধ্যমে সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠি।

তাছাড়া ইচ্ছা করলেও তো ফিরতে পারব না। ৬২৫ ডলার মূল্যের টিকিট পাব কোথায়? ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে যে গা ঢাকা দিয়ে থাকব তারও কি কোন উপায় আছে নাকি? দুদিন আগে হোক আর দুদিন পরেই হোক যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষুষ্মান টিকটিকি যে ভাবেই হোক আমাকে ধরে ফেলবেই। আর ধরতে পারলেই ডিপোর্টেষান্ অর্থাৎ বিমানে বসিয়ে দিয়ে গুড্ বাই বলে পাঠিয়ে

দেবে ভারতে। সমস্ত খরচা দাবী করবে ভারত সরকারের কাছে। আর ভারত সরকার আদায় করে নেবে আমার গ্যারাণ্টার সংসঙ্গের কাছ থেকে! সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারীর নায়ক হতে হবে আমাকে! আর ভাবতে পারলাম না! সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল। অজ্ঞাতে' কেঁদে উঠলাম—দয়াল তুমি ব'লে দাও আমি কি করব?

পার্কের নির্জন কোণে বেঞ্চিতে ব'সে কতক্ষণ যে কেঁদেছি তা মনে নেই। তবে যখন ভাবান্তর হল তখন দেখি মনে অনেকখানি বল ফিরে এসেছে। মনে-মনে স্থির করলাম মিঃ গ্রোভারের বাসাতেই কাজ করব। পায়খানা ঘরদোর পরিষ্কার করলামই বা। ভিসার সমস্যা তো আর থাকবে না। আইন সম্মতভাবে এদেশে থাকতে পারব। ৮ ঘণ্টা কাজ করেও ১৬ ঘণ্টা সময় হাতে থাকবে মানুষের কাছে আমার দয়াল ঠাকুরের কথা পৌঁছে দেবার। এদেশে তো ডিগনিটি অব লেবার আছে। অর্থাৎ সব কাজই কাজ! ছোট কাজ বা বড় কাজ বলে কিছু আছে এরা মনে করে না। আমিই বা মনে করব কেন? তাছাড়া পায়খানা তো আর হাত লাগিয়ে পরিষ্কার করতে হবে না। ডিটার জেন্ট (এক প্রকারের গুঁড়ো সাবান) ঢেলে দিয়ে ব্রাস করে দেব। দোষ কি তাতে?

নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে দেখা করলাম মিঃ গ্রোভারের সঙ্গে। কিন্তু মিসেস্ গ্রোভার সেদিনও ফেরেননি নিউইয়র্ক থেকে। ফাইনাল কথা দিতে পারলেন না মিঃ গ্রোভার। এইভাবে পর-পর দুদিন ফিরে এলাম। তৃতীয় দিনে দেখা করতেই মিঃ গ্রোভার জানালেন—"আমি খুবই দুঃখিত মিঃ বিশ্বাস। আমার মিসেস্ আপাততঃ কোন লোক রাখতে চান না—বিশেষ ক'রে কোন শিক্ষিত ভারতীয় যুবককে।" কারণ হিসাবে বললেন,—"একজন ভারতীয় যুবক বাসায় ছিল। তার অসুখ হলে প্রায় এক হাজার ডলার খরচা করে তার চিকিৎসা করান হ'লো। সে সুস্থ হয়ে উঠে যেই "বেটার চান্স" অর্থাৎ

অন্য ভাল সুযোগ পেল, বাসার কাজ ছেড়ে চলে গেল।" আমিও হতাশ হয়ে ফিরে এলাম যথাস্থানে।

আর ওয়াশিংটনে ব'সে থেকে লাভ হবে না। ডাঃ কোল্ বললেন "মিঃ বিশ্বাস, ভিসা পরিবর্তনের কোন আশাই যখন নেই তখন যে'কটা দিন থাক সে'কটা দিন নিউইয়র্ক শহরে গিয়ে চেষ্টা কর। স্কুল, কলেজ, চার্চ প্রভৃতি স্থানে ঢুঁ মেরে দেখ কোন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার কি না! আমি তোমাকে দুই মাসের থাকা-খাওয়ার খরচা বাবদ ৪০০ ডলার দিচ্ছি।"

অবাক হলাম ডঃ কোলের কথা শুনে। এমন কথা তো ছিল না। তিনি শুধু কাগজ-কলমে দায়িত্ব নিয়েছেন আমার থাকা-খাওয়ার। এই মর্মে এই দেশের কোন নাগরিক বা চাকুরীরত ইমিগ্র্যান্ট গ্যারান্টি না দিলে টুরিষ্ট হিসাবে এদেশে আসা যায় না। বাস্তবে এতগুলি টাকা দিয়ে আমায় তিনি সাহায্য করবেন তা কখনও প্রত্যাশা করিনি। পরমদয়াল ঠাকুরের অহেতুক করুণায় অভিভূত হয়ে বললাম—ডঃ কোল্ কোন্ ভাষায় যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব-তা বুঝতে পারছি না।

কোল-দম্পতি এক সঙ্গে সানুনয়ে ব'লে উঠলেন,—"না, না! কৃতজ্ঞতার কথা ভেবো না। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন সেবাতেই লাগতে পারিনি। তিনি দয়া ক'রে তাঁকে সেবার এই সামান্য সুযোগটুকু যে দিয়েছেন তার জন্য আমরাই নিজেদের ধন্য মনে করছি। তোমার জন্য যা করছি তা' ঠাকুরই করেছেন। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।'

কি অপূর্ব বিনয় ও ভক্তি এঁদের। হৃদয়ে ভক্তির প্রভাব যে সর্বদেশে, সর্ব মানুষের জীবনেই যে এক তা বুঝতে পারলাম। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, ভারতীয় বা অভারতীয়, কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ—যে জীবনই হোকনা কেন ভক্তিকুসুম হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হলে একই ফল প্রসব করে।

ডঃ কোল্ অফিসে চলে যান বেলা প্রায় ৯টায়। মিসেস্ কোল্

ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে এসে বসেন ড্রয়িংরুমে আর গল্প শোনেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের। বিশ্বাস ও ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক স্থৈর্য প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মাঝে-মাঝে এদেশের আদবকায়দা সম্বন্ধে পরামর্শও দেন আমাকে। একদিন বললেন,—এদেশের মেয়েদেরকে 'মা' সম্বোধন ক'রোনা, এরা পছন্দ করে না। আমাকে যে 'মাদার' বলে ডাক তা আমি এপ্রিসিয়েট করি, কারণ তোমাদের মানসিক গঠনের সঙ্গে পরিচিত। তুমি মেয়েদেরকে সোজা নাম ধরে ডাকবে। কেও কিছু মনে করবে না।

ডঃ কোল্ একদিন বললেন,—"অনেকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে। তোমার সঙ্গে হয়তো মাখামাখিও করবে অনেকে। কিন্তু দেখবে বিশ পঁচিশ দিন যেতে না যেতেই তোমাকে আর যেন চিনতেই পারছে না। তোমার থেকে অনেকে দূরে সরে গেছে। তাতে মন খারাপ ক'রো না। তোমার নিজের ক্রটীর জন্য এরা যে এমন করছে তা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ো না। এটা এখানকার মানুষের স্বভাব। কোন এক জনে বা একটা জিনিসে মন স্থির করে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না এরা।

২২শে জুলাই নিউইয়র্কে যাবার দিন স্থির হল। স্পেন্সারদাকে (Mr. E. J. Spenser) ফোন করেছিলাম। শ্রীমান হরিনারায়ণ (চক্রবর্তী) ফোন ধরেছিল। আমার গলা শুনেই উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল, এখানে চলে আসুন দাদা। একা একা থাকতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। কালই চলে আসুন।

মিসেস্ কোল্ ৩৫০ ডলারের ট্রাভেলার'স্ চেক্ ও ৫০ ডলার ক্যাশ্ আমার হাতে দিলেন। ডঃ কোল্ তাঁর গাড়ীতে করে গ্রেহাউণ্ড বাস স্ট্যাণ্ডে নিয়ে এলেন। নিজের পকেট থেকে ১৫ ডলার মূল্যের টিকিট কিনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "মিঃ বিশ্বাস, তোমার দৃঢ়প্রত্যয় ও নিষ্ঠা দেখে আমি বিশ্বাস করি ঠাকুর তোমার মাধ্যমে তাঁর কাজ করাবেনই। তাঁকে মাথায়

নিয়ে চলো। আমরা তো রইলামই তোমার। যোগাযোগ রেখো। আমার হাত দুটো ধরে গভীর আগ্রহের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বললেন—please get in (ভিতরে যাও) ছলছল চোখে তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বাসে উঠলাম। বাস ছেড়ে দিল। রুমাল নেড়ে বিদায় জানালেন ডঃ কোল্। সেই রুমাল দিয়েই যে চোখ মুছলেন তিনি তা' স্পষ্ট দেখতে পেলাম কাঁচের জানালা দিয়ে।

আমাদের যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে, এদেশে তেমনি একস্‌প্রেস ওয়ে। অবশ্য নামের পার্থক্যের সঙ্গে কলেবরের পার্থক্য অনেক বেশী। পাশাপাশি চার খানা কার বা বাস্ একসঙ্গে ছুটে চলেছে একই দিকে। সমান সংখ্যক কার বা বাস্ বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে বিপরীত দিক থেকে। আপ ও ডাউন ওয়ের মাঝখানে লোহার রেল দ্বারা সীমানা করা। নির্দিষ্ট ট্রাকগুলি সাদা দাগে চিহ্নিত করা। মাঝে-মাঝে গাড়ির গতিবেগ স্মরণ করিয়ে দেবার ধাতুর বিজ্ঞপ্তি সূচকবোর্ড। তাতে লেখা আছে মিনিমাম স্পীড্ ৬০ মাইল (ঘন্টায়)। তার কম গতিতে গাড়ী চালালে জরিমানা দিতে হবে ড্রাইভারকে। গতিবেগ সম্বন্ধীয় আইন ভাঙ্গা খুবই মুশকিল। কারণ মাঝে-মাঝেই লেখা আছে 'speed detected by radar' (র‍্যাডার যন্ত্রের দ্বারা গতি নির্ণয় করা হচ্ছে)। তাছাড়া ঘন্টায় ৬০ মাইলের কমে গাড়ী চালিয়ে আইন ভঙ্গ করবেই বা কেন ? আমাদের দেশের N. H.-এর মত এই রাস্তায় লোক, গরুবাছুর, ইত্যাদি একটি প্রাণীও চলাফেরা করে না। ট্রাক-লরী, রিকসা, গরুর গাড়ী, টম্‌টম্—কারও টিকি দেখতে পাওয়া যাবে না এই একস্‌প্রেস ওয়েতে।

বিরাট বপু বাস। ভেতরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। প্লেনের সীটের কায়দায় বসবার ব্যবস্থা। বাসের ভেতরেই ল্যাভেটরীর ব্যবস্থা। ওয়াশিংটন থেকে ছেড়ে মাঝখানে একটি মাত্র স্থানে দু'মিনিট দাঁড়াল আমাদের বাস। আবার ছুটে চলল শাঁ শাঁ শব্দে। তিনশ মাইল

রাস্তা ৪ ঘন্টায় পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে হাজির করল নিউইয়র্ক শহরের গ্রে-হাউণ্ড বাস টার্মিনাসে।

বাস-স্টেশন যে এতবড় হ'তে পারে তা না দেখলে ভাবাই যায় না। মোট কত তলা (storied) তা মনে নেই, তবে আমাদের বাস যে সমতলভূমি ছেড়ে ৮ তলা বাড়ীর ওপরে উঠে গেল তা মনে আছে। বিভিন্ন রুটের শত-শত বাস। বাস থেকে নেমে আমরা যে গেট দিয়ে লাউঞ্জে প্রবেশ করব তার নাম্বার ১০৮।

আমার স্যুটকেশ নেবার জন্য অপেক্ষা করছি বাসের পাশে। কোথায় আমার স্যুটকেশ! বাসের ভেতরে তো রুমাল বা ভ্যানিটি ব্যাগ রাখবার জায়গা, বড় জোর ছোট ফোলিও রাখা যেতে পারে নিজের-নিজের সীটের ওপরে ব্যাংকে। ভেবেছিলাম যাত্রীদের মালপত্র নিশ্চয়ই বাসে মাথার ওপরে আছে। কিন্তু একি! বাসের ওপরটা তো টাক্‌পড়া মাথার মত ফ্যাপা-পোঁছা, তবে মাল গেল কোথায়? ডঃ কোল্ তো আমার স্যুটকেশ জমা দিয়েছিলেন এদের বুকিং-অফিসে। তাহলে মালপত্র বোধহয় অন্য গাড়ীতে আসছে।

দাঁড়িয়ে ভাবছি এবং দেখছি আর কোন গাড়ী আসে কিনা। এমন সময় একজন কর্মচারী এসে বাসের পেটে মারল একটা চাপ। সঙ্গে-সঙ্গে পেটটা 'হাঁ' হয়ে গেল আর বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এল যাত্রীদের বোঝা-বোঝা মাল।

কোনমতে টেনে-হিঁচড়ে স্যুটকেশ নিয়ে হাজির হলাম যাত্রীদের লাউঞ্জে। লাউঞ্জ তো নয় যেন গড়ের মাঠ। হাজার হাজার যাত্রী। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি স্পেন্সারদা বা হরিনারায়ণ এসেছে কিনা। কাউকে না দেখে বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। গন্তব্যস্থলে কেমন ক'রে যে যাব তা জানা নাই। কুলিও নেই এখানে। আমাদের দেশের কুলিরা শুধু যে মাল বহন করেই সাহায্য করে তা নয়। অজানা যাত্রী হলে সে কোথায় যেতে চায় জানালেই কোন্ গাড়ীতে যেতে হবে, কটার সময় কোন্ প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়বে

সর্বাঙ্গসুখস্ত বলে দেয়, যাত্রীকে যত্ন করে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পারিশ্রমিকের আশায়।

হরিনারায়ণ বলেছিল যে বাসটার্মিনাসে নেমে সাবওয়ে ধরে তাদের বাসার কাছের স্টেশনে নামতে হবে। সাবওয়ে যে কেমন ধরণের যানবাহন তা জানা ছিল না। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে মাটির বহু নীচ দিয়ে যে ট্রেন যাতায়াত করে তাকে বলে 'সাবওয়ে'। গোটা নিউইয়র্ক শহরের বুকের নীচ দিয়ে অসংখ্য ট্রেন দিন রাত ছুটে চলেছে। কিন্তু কোন্ লাইনে যাব, কোন্ স্টেশনে নামব তা কিছুই জানি না। আমার অসুবিধা হবে বলেই স্পেন্সারদা বলেছিলেন যে তিনি বাসটার্মিনাসে থাকবেন।

নিকটবর্তী একজন পুলিসকে আমার ঠিকানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—Excuse me please. Could you tell me how to contact with this address? (মাপ করবেন। অনুগ্রহ করে বলতে পারেন কি কেমন করে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করব।)

পুলিশ কিছু বলবার আগেই পেছন থেকে কে একজন আমায় জড়িয়ে ধরে বলল—Here is to contact please. (এই খানে যোগাযোগ করতে হবে)। পেছন ফিরে দেখি অঁদ্রে লুই। আমাদের ফরাসী গুরুভাই। বহুদিন দেওঘরে আশ্রমে ছিলেন। ডান দিক থেকে স্পেন্সারদা এসে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সঙ্গে রবার্ট কামিংদা। রবার্ট কামিংদা বললেন, রেবতী, বাসটা ১৫ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে, তাই তোমাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। আমরা কিন্তু ঠিক সময় এসেছি।

অঁদ্রে আমার স্যুটকেশ টেনে নিয়ে চলল। এস্ক্যালেটরে চেপে পাতালপুরীতে নেমে এলাম। আমাদের কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এসক্যালেটর মানে চলন্ত সিঁড়ি আছে। শুনেছি বোম্বেতেও নাকি আছে একটা। এখানে দেখেছি শত শত। বড় বড় কলেজ, রেলওয়ে স্টেশনে, বাস স্টেশনে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিভিন্ন স্থানে কত যে escalator তার সংখ্যা নেই। সিঁড়ি বেয়ে হেঁটে চলার

মত সময় কোথায় এদেশের লোকের। সিঁড়িই নিজে চ'লে যাত্রীকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলে।

আমরা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতেই ট্রেন এসে দাঁড়াল। আপনা থেকেই সমস্ত কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। আমরা প্রবেশ করতেই সব দরজাগুলি এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ী ছুটে চলল পবনের বেগে। গোটা গাড়ীটাতে দুটি মাত্র কর্মচারী। একজন চালক ও একজন মাত্র Conductor যিনি বৈদ্যুতিক সুইস্ টিপে সমস্ত গাড়ীর দরজাগুলি প্রত্যেক স্টেশনে খুলছেন ও বন্ধ করছেন।

পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন থামল। এক গোপীবেশী শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গে এক তরুণী উঠে এল আমাদের কম্পার্টমেন্টে। তার দেহ ট্রেনের ভিতরে কিন্তু হাতখানা বাইরে। দুদিক থেকে দরজা এসে চেপে ধরেছে তার হাতখানাকে। 'ইয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই দরজা খুলে গেল। হাত সহ তন্বী এসে বসল একটা সীটে। দরজা বন্ধ হল, ট্রেন ছেড়ে দিল। এরকম প্রায়ই হয়। তবে ভরসা এই যে দরজার ভেতরের কোন কিছু থাক্‌লে একটা পাল্লার সঙ্গে আর একটা পাল্লার পরিপূর্ণ সংযোগ হয় না। আর তা না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন স্টার্টই নিতে পারে না। কণ্ডাক্টারের সামনে যে নীল ও লাল রঙের আলো জ্বলে তাই দেখেই বুঝতে পারে কোন দরজাতে কোন কিছু আটক পড়েছে কিনা।

ট্রেন থেকে নেমে যথা সময় পেঁ ছলাম স্পেন্সারদার অ্যাপার্টমেন্টে। আমাকে দেখেই হরিনারায়ণ চমকে উঠল। বলল—আপনার শরীরের একি দশা হয়েছে দাদা। মনে হচ্ছে কত কাল খাননি আপনি।

ঘরে ঢুকেই পেলাম সরিষার তেলে কড়া সম্বারা দেওয়া মসুর ডালের গন্ধ। হরিনারায়ণ রান্না করেছে ভাত আর মসুর ডালের ঝোল। হাতমুখ ধুয়ে সকলের সঙ্গে খেতে বসলাম। পেট পুরে খেলাম সেই পাতলা ডাল ও ভাত। মনে হ'ল অমৃত খাচ্ছি বহুদিন পরে।

পরদিন থেকে শুরু হোল মেহনতী মানুষের মত সংগ্রামী জীবন। প্রতিদিন সকালে স্পেন্সারদা বেরিয়ে যান তাঁর চাকুরীস্থলে। জ্যানেটারের (সাফাই) কাজ করেন তিনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম, এ,হ'য়ে সাধারণ দিনমজুরের মত দোকানপাট পরিষ্কারের কাজ করতে বাধে না তাঁর। বাধলেই বা করবেন কি? পেট তো চালাতে হবে। ঘণ্টায় দু'ডলার হিসাবে যা পান তাই দিয়ে সংসার চলে তাঁদের তিনজনের। হরিনারায়ণ ও অঁদ্রে লুই এর খরচা তাঁকেই চালাতে হয়। আমি যাওয়াতে সংসারের লোকসংখ্যা হোল সাড়ে-তিনজন। অর্থাৎ আমার খাওয়া খরচার আধা আমিই বহন করতাম।

বাড়ীভাড়া অতি সামান্য। আমাদেরই গুরুভাই মিঃ নীল সেলডন ও তাঁর স্ত্রী লী সেলডন-এর বহুদিন পূর্বের ভাড়া করা বাসা। সাবেক ভাড়া বলে মাত্র ৩৭ ডলার দিতে হয় মাসে। সেলডন্ দম্পতি বর্তমানে গ্রীসে বেড়াতে গেছেন। সেখান থেকে ভারতে গিয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবেন। আশ্রমেও বাস করবেন কিছুদিন। প্রায় এক বৎসর পরে ফিরে আসবেন তাঁরা নিউইয়র্ক শহরে। সুতরাং এক বৎসর বাসা ভাড়ার সমস্যা বলে কিছু নেই। একমাত্র সমস্যা প্রতিদিন পাঁচতলা পর্যন্ত প্রতিবারে ৯০টা সিঁড়ি ভেঙ্গে আট-দশবার ওঠা-নামা করতে হাঁটুর ব্যায়ামটা একটু বেশীই হয়। হৃৎপিণ্ডের পরিশ্রম যে কম হয় তাও নয়। কারণ প্রতিবারেই বেশ কিছুসময় কাটাতে হয় তার দপদপানী প্রশমিত করতে।

হরিনারায়ণ খুব সকালে জলযোগ করেই চলে যায় আর, সি, এ ইনষ্টিটিউটে পড়তে। আমি দুপুরের রান্না করি হরিনারায়ণ ও আমার জন্য।

রান্না খাওয়াটা সমস্যা ছিল না। গ্যাসের স্টোভ ইচ্ছা করলেই একসঙ্গে চারটেই জ্বালিয়ে দিয়ে চারটা আইটেম রান্না করা যায়। শাকসব্জী অপর্যাপ্ত, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বেগুন, পালং, টম্যাটো, আলু প্রভৃতি সারা বছরে পর্যাপ্ত পরিমাণে

পাওয়া যায়। বরবটি, চালকুমড়া, লাউ, করলা, ঝিঙে, মুলো, এমনকি কলমীর শাক, পুঁইশাক ও কখনও কখনও ডাটার শাক পাওয়া যায় চীনাবাজারে। এছাড়া আমেরিকার শাকসব্জীর মধ্যে ব্রকলী, ব্রাসেলস্প্রাউট্ (বাঁধাকপির বাচ্চার মত), মাস্রুম্ (ব্যাঙের ছাতার মত), স্কোয়াস্ (দেখতে লম্বা জাতের মিষ্টি কুমড়োর বাচ্চার মত), বীট, গাজর, শালগম, মটরশুঁটী, সর্ষের শাক, ধনেপাতা তো আছেই। তবে কাঁঠালের এঁচড়, পটল ও সজিনার ডাঁটা পাওয়া যায় না। ফিলিপাইন থেকে আগত টিনের কৌটায় প্যাক করা রান্নাকরা এঁচড় ও সজিনার ডাঁটা কিনেছিলাম দু'দিন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত।

তেল, ঘি অপর্যাপ্ত। বাদাম তেল, ভুট্টার তেল, তিল তেলের তো কথাই নেই। সরিষার তেলও পাওয়া যায়। কয়েকবার তো কলকাতার গণেশমার্কা খাঁটি সরিষার তেলই কিনেছিলাম। পরে অবশ্য লণ্ডন থেকে আগত সরিষার তেল গুজরাটী দাদাদের দয়ায় সারা বৎসরই মিলেছে। মাখনের কিলো মাত্র ২ ডলার। অর্থের ইউনিট ধরলে দুই ডলারকে দুই টাকা বলা যেতে পারে। খরচের বেলায় ২ ডলার সমান ১৫ টাকা ধরলে আয়ের অঙ্কটাও ভারতীয় মুদ্রায় প্রকাশ করা উচিত। তাহলে একজন দিনমজুরের দৈনিক আয় দাঁড়ায় ১৬ ডলার অর্থাৎ প্রায় সোয়াশো টাকা।

ভারতের মানুষ আয় করে টাকায়, ব্যয়ও করে টাকায়। এখানে মানুষ আয় করে ডলারে। ব্যয়ও করে ডলারে। সুতরাং পারিশ্রমিক হিসাবে যা অর্জন করে তার ইউনিট সমান ধরতে দোষ কি ?

ঘণ্টায় দু'ডলার হিসাবে একটা লোকের একদিনের আয় হয় ১৬ ডলার। একই হিসাবে ভারতে একটা লোকের আয় হবে ১৬ টাকা, যদিও মজুরের ভাগ্যে জোটে বড়জোর ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা। এখন দুজন যদি বাজারে যায় তবে বাইং ক্যাপাসিটি (অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা) কার বেশী তা দেখলেই বোঝা যাবে জিনিসপত্র সস্তা কোথায় ! ১৬ ডলারে সুপার ফাইন চাল পাওয়া যাবে ৪৮ কিলো,

আর ভারতে ১৬ টাকায় সাধারণ চাল পাওয়া যাবে বড়জোর পাঁচ থেকে সাত কিলো। আমেরিকায় মাখন পাওয়া যাবে ৮ কিলো, ভারতে আমুল পাওয়া যায় আধকিলো। সেখানে দুধ পাওয়া যাবে ৪৮ থেকে ৫০ কিলো। আর এখানে পাওয়া যাবে ৬ থেকে আট কিলো, এতে বোঝা যায় জীবনযাত্রার জন্য মূল-লওয়াজিমা যে খাদ্য তা' ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকাতেই সস্তা।

তবে একটা কথা; আমেরিকায় খাঁটি দুধ বা মাখন পাওয়া যায় না! "পিওর মিল্ক" আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে দোকানী অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে বলে 'নো'। দুধ বা মাখন পাওয়া যায় অপর্যাপ্ত। তার জন্য গোয়ালাকে তোষামোদ করতে হয় না বা খাটালে যেয়ে 'ধন্না' দিতে হয় না। এক প্যাকেট আমূলের জন্য দশদোকানে ঘুরতেও হয় না। দেড়শ কি দু'শো গজ পর-পর "ডেলিকেটেসেন্স" অথবা ছোট বড় সুপার মার্কেট। খাদ্য-সামগ্রী অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সেখানে পাওয়া যায়। তবে পিওর বিশেষণ যুক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। কারণ পিওরের (খাঁটি) বিপরীত শব্দ ভেজাল কথাটার সঙ্গে পরিচয় নেই দোকান-দারদের।

যাহোক আহারাদি সেরে আবার শিকারের আশায় বেরিয়ে পড়তাম রাস্তায়। আমাদের বাসার কাছেই নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। তার ক্যাম্পাসের মাঝখানেই ওয়াশিংটন পার্ক। সেখানেও অনেক ছেলেমেয়ে অবসর সময়ে বিশ্রাম করে। তার দক্ষিণ দিকে লোব্ স্টুডেন্ট সেন্টার। ছেলেমেয়েরা অনেকে এখানে লাঞ্চের পর বিশ্রাম করে। উভয়স্থানে কিছু-কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু দু'একজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলাপ হয় নাই। অনেকে দূরদূরান্ত থেকে নিজেদের কারে করে আসে। কে কোন্ দিনে কোন্ সময়ে আসে তার কোন স্থিরতা নেই। তাই আমিও কারও সঙ্গে আলাপে লেগে থাকতে পারলাম না। আলাপ যখন করি তখন তো তাদের কথাবার্তায় মনে হয় তারা বেশ interested.

কিন্তু সে interest যে আর কোন বৃহত্তর iuterest-এর চাপে শুকিয়ে যায় তা বুঝতে পেরেছিলাম পরবর্তীকালে।

ভারতবর্ষে বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অনেকবার বলেছি। ভাবলাম এখানকার স্কুলে যেয়ে যদি মাস্টারমশাইদেরকে প্রভাবিত করতে পারি তাহলে তো সমাজের শিক্ষিত লোকের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা ও জীবনদর্শন প্রচারের সুযোগ পাব। ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে অচেনা লোকের পক্ষে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে তার শিক্ষকদের সঙ্গে বিশেষ করে অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করার সম্ভাবনা কম। কারণ ফোনে যোগাযোগ করলেই অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী কোন সুন্দরীর নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে হয়। কি আমার নাম, কেন দেখা করতে চাই ইত্যাদি প্রশ্ন। Interview-তে পাশ করার পর তন্বীকণ্ঠের মিষ্টিস্বর ভেসে আসে, 'Please see Mr. 'X'first (অনুগ্রহ করে X মহাশয়ের সাথে দেখা করুন) 'X' এর সঙ্গে নিদিষ্ট দিনে শুভক্ষণে দেখা করলে তিনি আপ্যায়নের সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রে করমর্দন করেন! দু'চার মিনিট আলাপ করে বলেন, Thank you for your kind offer. We will keep you in our mind. (আপনার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ। আপনার কথা আমরা মনে রাখব।)

এমনি করে ঘুরে এলাম কয়েকটা স্কুল থেকে। শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কে সমস্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের চ্যান্সেলর ডঃ ক্রীবনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁর সেক্রেটারী Mrs. William একজন কৃষ্ণাঙ্গী বর্ষিয়সী মহিলা। তিনি আমার সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ করে প্রীত হলেন। আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন—Your face, your look indicate that you have peace in your heart ; you are the happy man and I believe, you can give peace to us. I hope I will be fortunate to meet you here soon. (তোমার চোখ-মুখের চেহারা বলে দেয় যে তোমার অন্তরে শান্তি আছে। তুমি সুখী মানুষ, এবং আমি

বিশ্বাস করি যে তুমি আমাদেরকে শান্তি দিতে পার। আমি আশা করি শীঘ্রই এইখানে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে।)

Mrs. William আমায় যেমন বললেন ঠিক তেমনই বিভিন্ন স্কুলের Principal-এর কাছে আমার ভূয়সী প্রশংসা করে চ্যান্সেলারের পক্ষ থেকে কোথাও বা অফিসিয়াল চিঠি পাঠালেন, কোথাও বা ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে আমি তাদের স্কুলে যাচ্ছি। শহরের বিশিষ্ট কয়েকটা স্কুলে যখন গেলাম, সেখানকার অধ্যক্ষ অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাকে, কোথাও নিজে কোথাও বা উপাধ্যক্ষকে সঙ্গে দিয়ে স্কুলের বিভিন্ন বিভাগ, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী, বিভিন্ন ক্লাসে কেমন করে পড়ান হচ্ছে তা ঘুরিয়ে দেখালেন ও স্কুলের ইতিহাস প্রভৃতি সমুদয় বিষয় অতি যত্নের সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিকে যেমন করে পরিবেশন করে তেমন করেই পরিবেশন করলেন। এক-একটা স্কুলে তিন ঘন্টা পর্যন্ত অতিবাহিত করলাম! কিন্তু নিজের কথা বলার সুযোগ পেলাম কম। তবে এই সুযোগে এখানকার হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে একটা বাস্তব জ্ঞান লাভ করলাম তাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হলেও লোকসান হোল না

সব স্কুলেই একই কথা। প্রত্যেক স্কুলে প্রতি বৎসরে বিদেশের বহু মনীষী ব্যক্তি guest-speaker হিসাবে আসেন। যিনি যে subject-এ authority তিনি সেই subject-এর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে talk করেন। এ বছরে কে কে আসবেন তা বহু আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর যাদের speaker এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই তাদের order place করা হয়ে গেছে স্পীকার এজেন্সী (বা ব্যুরো)-দের কাছে।

নিউইয়র্ক শহরে এক ডজনেরও বেশী Speaking Bureau (ব্যুরো) বা Agency আছে। এদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা club থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে চীন, জাপান, ভারতবর্ষ বা ইউরোপীয় দেশ থেকে সেই সেই দেশের নাম করা পণ্ডিতকে

আমন্ত্রণ করা। প্রত্যেককে হয়তো দশবারোটা বক্তৃতা দিতে হয়। বিনিময়ে তারা প্রত্যেকে হয়তো পান যাতায়াত খরচা ও পাঁচহাজার কি দশহাজার ডলার। আর এই agent-রা একটা বক্তৃতাতেই হয়তো পাঁচটা বক্তৃতার খরচা তুলে নেয়। এটা এদের বিরাট ব্যবসা। লক্ষ লক্ষ ডলার invest করে এই কারবারে।

এদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম। এদের নির্দেশ মত আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ফটো পাঠালাম। দু'তিনটি প্রতিষ্ঠান interview call করল। কিন্তু কোন্ বিষয়ে specialist তা জিজ্ঞাসা করায় যখন বললাম যে প্রতিটি জীবনে যে বিষয়গুলি একান্ত অপরিহার্য—যেমন ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, দর্শন, জননীতি, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন প্রভৃতি—সে সব বিষয় বলতে পারব, তখন তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। কেউ-কেউ আমার মাথায় ছিট আছে বলে মনে করল বলে বোধ হোল। অবশ্য আলাপ-আলোচনার পরে তারাও বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করলেন না। আশ্বস্ত হলেন। তবে তাদের বায়না, "যে বিষয়ে তুমি বলবে সে বিষয় লিখে আনতে হবে।" তারা সেটাকেই 'সেল' করার চেষ্টা করবে, বিলি করবে শ্রোতাদের মাঝখানে

আমি জানালাম, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার extempor (উপস্থিত মত) বলা অভ্যাস। তাছাড়া আমার speech কেমন হবে তা নির্ভর করছে কি ধরণের audience-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। একজন বললেন যে, women audience-এর সামনেই বলতে হবে কারণ তার খরিদ্দার শুধু women's club. আমি জানালাম যে women হলেও কোন বিশেষ বিষয় কিভাবে বলব তা নির্ভর করছে সেই women-রা কি ধরণের তার উপর। যদি কুমারী audience হয় তাহলে একপ্রকার, বিবাহিতা হলে আর একরকমের আর mothers হ'লে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। সুতরাং পূর্ব থেকে লিখে দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যিনি interview নিচ্ছিলেন তিনি বারবার অনুরোধ করলেন লিখে দিতে। কিন্তু

আমি লিখিও নাই, আর এদের সঙ্গে দেখাও করি নাই। যদিও আরও দু'বার টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

এদিকে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। বিভিন্ন চার্চের ডাই-রেক্টরদের সঙ্গে দেখা করলাম। ফল কিছু হোল না। পথে চলতে চলতে যখনই হতাশায় অবসন্ন হ'য়ে ভেঙ্গে পড়তাম তখনই কোন খালি চার্চে ঢুকে পড়তাম। পবিত্র পরিবেশ। নির্জনে বসে নাম করতাম। আর ঠাকুরকে স্মরণ ক'রে প্রার্থনা করতাম, 'হে পরম-পিতা, তুমিই তো একযুগে যীশু হ'য়ে পৃথিবীতে এসেছিলে। তুমি দয়া করে তোমার মহিমাকীর্তন করবার সুযোগ করে দাও তোমার এই শ্রীমন্দিরে।'

পরবর্তীকালে সুযোগ পেলামও একদিন। এক চার্চ থেকে আমন্ত্রণ আসল সেখানে বলবার জন্য। যখন সেখানে যেয়ে পৌছালাম তখন বিষয় জানতে পারলাম। আমাকে বলতে হবে E. S. P. অর্থাৎ extra sensory perception (অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) ও what are the factors that prevent western mind from accepting the eastern attitude towards life—(কি কি কারণে পাশ্চাত্ত্য মন প্রাচ্যের জীবনসম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে না।) এই বিষয়ের ওপরে। বলা নাকি সুন্দর হয়েছিল, অনেক মহিলা যীশুর প্রতি আন্তরিক উচ্ছ্বাসে চোখের জলও ফেলে-ছিলেন দেখলাম। অনেকে এসে করমর্দন করে বললেন—excellent, marvellous, thank you for your superb speech ইত্যাদি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই তারপর একখানা আরামদায়ক কারে করে ৬০ মাইল দূরে আমার বাসায় পৌছে দিয়ে গেল আমাকে। আর কখনও যোগাযোগ হয়নি তাদের সাথে। চার-পাঁচ দিন পরে ডাকে আগত একখানা খাম খুলে দেখি তার মধ্যে ৫০ ডলারের একখানা চেক্।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বক্তৃতা দিয়ে কি টাকা উপার্জনের জন্য এসেছি এখানে। আমার বক্তৃতার মাধ্যমে যদি

শ্রোতারা আমার একান্ত যিনি সেই ঠাকুরকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত না হ'য়ে উঠল তবে বক্তৃতার ব্যবসায় লাভ কি? পরবর্তীকালে অনেক স্কুলে কলেজে ভাষণ দিয়েছি। তাঁরা যে বিষয়ে বলতে বলেছে তার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলেছি। দীক্ষাও যে দু'একজন নেয় নি তা নয়। তবে দীক্ষার থেকেও টাকার অঙ্ক পেয়েছি বেশী। টাকা নিতে আপত্তি করলে কর্তৃপক্ষ বলেছেন, "We can't accept your service and help without remuneration for it. If you don't accept, it will be an insult to us. (বিনা পারিশ্রমিকে আমরা তোমার সেবা ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না। যদি তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ না কর তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে অসম্মান সূচক হবে)। অগত্যা গ্রহণ করেছি।

ইতিমধ্যে ভিসার মেয়াদ একবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু সারা শহরে দিন রাত ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে গেছি। মনের স্থৈর্যের মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রতিদিন সমানে কান্না ছাড়া আর কোন সম্বল দেখতে পাচ্ছি না। বর্ধিত সময়টুকু ফুরিয়ে গেলেই ফিরে যাবার পালা।

এমন সময় একদিন একটা ক্ষীণ আশার আলো ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

হরিনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রংক্সো (Bronx) চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম। গেটে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি আমাদের দু'জনের কাছে যে পয়সা আছে আমাদের সাথী সমেত তিনজনের টিকিট হবে না। অগত্যা ফিরে আসতে হয়।

গেটে কর্তব্যরত ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীকে বললাম, আমরা বিদেশী, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পয়সা নেই যাতে টিকিট করে চিড়িয়াখানা দেখতে পারি। তুমি কি কোন ব্যবস্থা করতে পার?

আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেল উক্ত কর্মচারী, দুই মিনিট পরে ফিরে এসে বলল—ইউ মে ভিজিট দি জু ফ্রী। শ্রদ্ধা হল কর্মচারীর ব্যবহারের জন্য। ওপরওয়ালার কাছ থেকে

অনুমতি নিয়ে এল আমাদের স্ত্রী দেখাবার জন্য। অথচ চোখে-মুখে বা ইঙ্গিতে আমাদের দয়া করছে এমন কোন ভাব প্রকাশ পেল না। উপযুক্ত সম্মানের সাথে আমাদেরকে গেট পাশ দিয়ে দিল। চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখছি। নানা দেশের দর্শনার্থী। আবার একজন মহীশূরী ভদ্রলোক মিঃ P. K. Johan-এর সঙ্গে পরিচয় হোল। আমার সমস্ত কথা শুনে তিনি আশ্বাস দিলেন—নিউইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসে আমার জন্য একটা চাকরীর চেষ্টা করবেনই।

পরের দিনই ফোন করলেন আমাকে। বললেন—U.N.O.-তে ভারতীয় স্থায়ী মিশনের জন্য একজন টাইপিস্টের পোস্ট খালি হয়েছে। আজই দরখাস্ত করুন। সেই দিনই দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে জমা দিয়ে এলাম ভারতীয় দূতাবাসে।

ভদ্রলোকের চেষ্টায় তিনদিন পরেই interview-এর জন্য call পেলাম। পথে যেতে যেতে পরমপিতাকে মনে-মনে ডাকছি—'ঠাকুর, কোনদিন বাঁধাধরা চাকরি করি নাই। তোমার কোনদিন ইচ্ছা নয় যে আমি চাকরি করি। অথচ আমি এদেশে থাকবার আর দ্বিতীয় কোন পথও দেখছি না। তাই বাধ্য হয়ে ভারতীয় দূতাবাসে চাকরির চেষ্টায় যাচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই করো দয়াল।

যার কাছে দরখাস্ত করেছিলাম। তিনিই interview নেবেন। তাঁর নাম মিঃ ড়ি, কে, মৈত্র। তিনি জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী ভারতীয় মিশনের অ্যাটাচী। ইন্টারভিউ দেবার প্রাক্কালে আলাপ হতেই আমি সৎসঙ্গ থেকে এসেছি শুনে উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন—সৎসঙ্গের বড়দাকে চেনেন। তিনি আমার দাদার শ্বশুর। আমার দাদা শ্রীযুক্ত অসিত মৈত্র, বড়দার বড় মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

আমার আমেরিকার আসবার উদ্দেশ্য এবং ভিসার ব্যাপারে যে অসুবিধায় পড়েছি তো শুনে খুব সহানুভূতিশীল হ'য়ে উঠলেন। বললেন, এ-কাজটা যদি পেয়ে যান তাহলে আপনার কোন সমস্যাই থাকবে না। কাজ হ'লে ভাল টাকাও পাবেন। চাকরি করেও যথেষ্ট সময় পাবেন ঠাকুরের বাণী পরিবেশন করবার।

যথাসময়ে টাইপিং টেষ্ট হয়ে গেল। মুখে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না ভদ্রলোক। বললেন—আমায় ফোন করবেন। "রেজাল্ট কি হোল বাসা থেকে জানাব।"

পরের দিন ফোন ধরতেই মিঃ মৈত্র আনন্দের সঙ্গে জানালেন, "আপনাকেই select করে আপনার নাম রেকমেণ্ড করে অ্যাম্বাসেডরের কাছে পাঠিয়েছি, হয়ত সোমবার থেকে join করতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে মিঃ জোহানও ফোন করে জানালেন যে একমাত্র আমিই সিলেকটেড হয়েছি। আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, সোমবারে জয়েন করেই মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু। কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়! তাছাড়া আপনার ভিসাসমস্যা তো মিটে গেল। যতদিন কাজ থাকবে ততদিন বুক ফুলিয়ে থাকতেও পারবেন এদেশে। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করলাম, হে দয়াল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এমন যোগাযোগ তো আমি কল্পন'ও করি নাই। মিঃ জোহানের সঙ্গে পরিচয় না হলে কেই বা এমন আপনজনের মত সবরকম সংবাদ দিয়ে সাহায্য করতো? আর শ্রীযুক্ত মৈত্র-মহোদয়ের ন্যায় পরমাত্মীয়ের মত সহৃদয় বান্ধব না পেলে কেমন করে এ চাকরি পেতাম অজানা বিদেশে। বিশেষ করে দূতাবাসের কর্মচারীদেরই কত আত্মীয় বন্ধু 'হা' করে আছে এখানে একটা যে-কোন কাজ পাবার জন্য।

যাই হোক, একদিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে শীঘ্রই দেশে ফিরে যেতে হবে না ভেবে, বা মাসে-মাসে প্রায় তিনহাজার টাকা পকেটে আসবে বলে, ঠিক তেমনিই আবার আশঙ্কা হচ্ছে এ কাজ করতে পারবো কিনা ভেবে। কারণ, বাঁধাধরা চাকরি করার অভ্যাস নেই কোনদিন। দেওঘর সেন্ট মেরী বালিকা বিদ্যালয়ে আড়াই বছর বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছি বিনা পারিশ্রমিকে। দেওঘর 'বাঙলা গার্লস' কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেছি চার মাস মত, সপ্তাহে সাত কি আটটা ক্লাস নিয়ে।

প্রত্যহ দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত কলুর বলদের মত ঘানি ঘুরাব কেমন করে? হাঁফিয়ে উঠব যে। তাছাড়া ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না।

আমি চাকরি করি। আট ঘন্টা চাকরি বটে। কিন্তু কাজে যাওয়ার আগে পাছের প্রস্তুতিতে কত চারঘন্টা চলে যাবে। তাহলে ঠাকুরের কথা মানুষকে বলব কি করে? মানসিক দ্বন্দ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। চলার পথে এমনতর দ্বিধাসঙ্কুল সমস্যায় যখনই পড়েছি তখনই পরমপিতার কাছে আকুল হোয়ে প্রার্থনা করেছি, 'দয়াল' কিসে আমার মঙ্গল হবে তা জানি না, তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর দয়াল।' পথ পেয়েছি প্রতিবারেই।

সোমবার সকাল থেকেই মন প্রায় ভার হয়ে আছে। ফোন বেজে উঠলেই আনন্দে ও আশঙ্কায় দোদুল্যমান মন চঞ্চল হয়ে উঠছে। এই বুঝি দূতাবাস থেকে আহ্বান এল, আজই কাজে যোগদান কর।

স্পেন্সারদা কাজে বেরিয়ে গেছেন। হরিনারায়ণ স্কুলে চলে গেছে। ঘরের দরজা বন্ধ। দয়াল ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে আকুল হোয়ে কাঁদছি ও প্রার্থনা করছি, 'দয়াল, তুমি বলে দাও আমি কি করব?"

চারদিন পার হয়ে গেল। কোন সংবাদ এল না ভারতীয় দূতাবাস থেকে। নিজে যখন মিঃ মৈত্রকে ফোন করলাম তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন—মিঃ বিশ্বাস, কিছুই বুঝতে পারলাম না কি যে এর রহস্য, একজন লোক নেবেই, তুমিই একমাত্র ক্যান্ডিডেট্ যাকে নির্বাচন করে পাঠিয়েছি। অথচ রাষ্ট্রদূত এখন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টই দিলেন না! আমি খুবই দুঃখিত তোমার জন্য।

মিঃ জোহানও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—তোমার হয়ে যাওয়া চাকরি কেন যে হোল না, তা আমাদের সকলের কাছেই ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। দুঃখ কোর না। আবার সুযোগ পেলেই তোমায় জানাব।

ভিসা পরিবর্তন হওয়া বা এদেশে বেশীদিন থাকবার আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার দেখছি। মনের মধ্যে অজানা আশঙ্কা ওঠা নামা করছে। ভিসা পরিবর্তন যদি হয়ও, তবে

জোর আর একমাসের জন্য। তারপর আমি ফিরে যাবো কি করে? ডঃ কোল যে টাকা দিয়েছিলেন তা তো কবে শেষ হয়ে গেছে আহারাদি ও নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করতে। শহরে তিন রকমের যানবাহন। মাটির তলায় ট্রেন বা সাবওয়ে, ওপরে বাস ও ট্যাক্সি। ট্যাক্সির ভাড়া মীটারে ঠিক হয়—যতদূর গেলাম তার উপরে। ট্রেন বা বাসের ভাড়া এক। যে কোন দূরত্বই যাই না কেন টার্মিনাস থেকে টার্মিনাস পর্যন্তই হোক, আর এক স্টেশন বা স্টপেজই হোক তাতে চাপলেই তিরিশ সেন্ট ভাড়া দিতেই হবে। প্রত্যহ ছুটাছুটি করতে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ডলার খরচ হ'তো।

ইতিমধ্যে আমার সংগ্রামের অধ্যায়ে আরও অনেক কিছু ঘটে গেছে যা উল্লেখ না করলে সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আহারাদির সমস্যা অনেকখানি মিটিয়েছেন স্পেন্সারদা। তবে হাট-বাজার করা, রান্না-বাড়া করার কাজ আমার। যেখানেই থাকি না কেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে এসে ডাল, ভাত, তরকারি রান্না করে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হোত আমাকে। স্পেন্সারদা সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে এসে স্নান সেরেই যাতে দুটো গরম গরম খেতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। আমায় যে বাধ্য করেছিলেন তা নয়। মানবিকতার বোধ থেকেই করেছিলাম আমি। সেবা না দিয়ে শুধু সেবা নেওয়া মানেই জীবনে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলা। আমি এখানে আসার পর থেকেই প্রত্যহ গরম ভাত, তরকারি দিনান্তে পেয়ে স্পেন্সারদাও খুশি ছিলেন খুব।

ঘরদোর, পায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখতে হোত আমাকেই। তাতে কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আমাদের আঁদ্রেবাবুর বদান্যতার খেসারত হিসাবে নিকোলাস ভিসিলির বেড়ালবাবুর প্রস্রাব ও পায়খানা প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হোত আমাকেই। ভিসিলি-দম্পতি বেড়াতে গেলেন গ্রীসে। আঁদ্রেবাবু তাদের পোষ্য এই বিড়ালটাকে দেখাশুনার ভার নিয়েছেন পরোপকার হিসাবে। পেছনে হয়ত উদ্দেশ্য ছিল চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি বা ভিসিলি যুগলের

অনুকম্পা লাভ। তাদের দ্বারা পরিচালিত জানী নামক সংস্থায় কাজ করতো আঁদ্রে। কিন্তু বিড়াল পরিচর্যার কাজ করতেন স্পেন্সারদা। আমি যেয়ে পৌঁছাতেই সে কর্তব্যটা আমার ওপরেই বর্তে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। প্রতিদিন ঐ পূতিগন্ধ পরিষ্কার করার নরকযন্ত্রণা মুখ বুঁজে ভোগ করেও যে টিকে থাকতে পেরেছিলাম তা নিতান্তই ঈশ্বরের করুণা।

হাতখরচা, যাতায়াত খরচা ইত্যাদির জন্য কায়িক পরিশ্রম করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাজ তো পাওয়া যায় একটু চেষ্টা করলেই। কোন দোকানে, বা রেষ্টুরেন্টে মজুরের কাজ পাওয়া দুষ্কর নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, আমার ওয়ার্ক পারমিট নাই।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ে। তাদের প্রত্যেকটি বিষয় (subject)-এর উপরে নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা বা প্রচেষ্টার উপরে দাঁড়িয়ে রচনা লিখতে হয়। তাকে বলা হয় টার্মপেপার। এই টার্মপেপার টাইপ করে জমা দিতে হয় অধ্যাপকের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানের সামনে নোটিশ বোর্ডের পাশে বিজ্ঞাপন সেঁটে রেখে আসতাম : সুদক্ষ টাইপিস্ট। টার্মপেপার, থিসিস ইত্যাদি সুলভে টাইপ করা হয়। কল ২২-৫৫৫ (ফোন নং)। প্রায় প্রতিদিনই ছাত্রছাত্রীরা ফোন করে আমার নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে তাদের টার্মপেপার আমার বাসায় দিয়ে যেত টাইপ করার জন্য। একটা টাইপমেসিন ছিল আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে। এটা ছিল মিঃ নীল সেলডনের মেসিন। খুব সম্ভবত তার পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসাবেই পড়েছিল এটা। তবে এর চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেলেও কর্মদক্ষতা বেশ ভালই ছিল। রাত্রির অবসরে টাইপ করতাম বসে বসে। অন্যান্য টাইপিস্টরা যেখানে প্রতিপৃষ্ঠার জন্য এক ডলার চার্জ করত, আমি চার্জ করতাম ৫০ সেন্ট বা আধা ডলার। তাই অনেকেই আসত আমার কাছে। হিসাব মত ৪ ডলার হলে ৫ ডলার, বা

ডলার হলে ৯ কি ১০ ডলার দিয়ে যেত। ভুল করে বেশী দিয়েছে মনে করে ফেরৎ দিতে গেলে একটু মিষ্টি হেসে বলত—"keep it." পরে জানলাম এই বেশীটা হচ্ছে tip বা বকশিস। বকশিস দেওয়া এদের সভ্যতার নীতি। চুলকাটার সেলুনে গেলে, ট্যাকসী চড়লে বা রেষ্টুরেন্ট খেলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, ভাড়া বা বিল দেওয়া ছাড়াও প্রামাণিক, ড্রাইভার ও ওয়েটারকে বকশিস দেওয়ার রীতি আছে। না দিলে জোর করবে না, তবে দিলে খুশি হবে। আর দেওয়াটা নিজের পক্ষেই আত্মমর্যাদার।

ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াই রাস্তায় পার্কে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। লোকজন কেউই কাছে আসে না। কার অত গরজ যে গায়ে পড়ে আলাপ করবে আমার সঙ্গে।

হঠাৎ একদিন মনে পড়ল শ্রীশ্রীবড়দা আসবার সময় আমায় বলেছিলেন—"একটা গেরুয়া রং-এর জামা তৈরী করে নিয়ে যাস্" রওনা হবার দু'তিন দিন আগে হঠাৎ বললেন তিনি। একদিনের মধ্যে একটা গেরুয়া রং-এর খদ্দরের পাঞ্জাবী ও একটা পায়জামা তৈরী করিয়ে এনেছিলাম। মনে হোল বড়দা কেন বললেন গেরুয়া রং-এর জামা নিয়ে আসতে।

একদিন ঐ পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরে দাঁড়িয়ে আছি। পথচারী একদল তরুণ ও তরুণী সবিস্ময়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল তুমি কি ভারতীয়? তুমি কি যোগী? যোগ শেখাতে পার?

এদের ধারণা ভারতীয়রা গেরুয়া পরলেই যোগী পদবাচ্য হয় এবং তারা অপরকে যোগ শেখাতে পারে। আমি বললাম—হ্যাঁ, আমি যোগ শেখাতে পারি।

তাদের অনেকেই আমার ফোন্ নাম্বার ও ঠিকানা নিয়ে গেল। যথাসময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল ও দীক্ষাও নিয়েছিল অনেকে।

কিন্তু কিছুতেই যে দানা বেঁধে উঠছে না। এই সব হিপি টাইপের ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দিলে তাদের ব্যক্তিগত উপকার হতে

পারে সন্দেহ নেই—যদি তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। কিন্তু সমাজে উঁচু স্তরের লোকদের কাছে পরমদয়ালের কথাগুলি পৌঁছে দে ার কাজে এরা কতখানি সহায়ক হবে তা সন্দেহের।

যাহোক, প্রতিদিন একই আশা নিয়ে ঘর থেকে বের হই যদি তেমন কোন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়—যার প্রভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বৎ সমাজের সামনে আমার প্রিয়পরমের কথাগুলি তুলে ধরতে পারি! কিন্তু আশা আর পূরণ হয় না। মন-প্রাণ বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে ব্যর্থতার হাহাকারে।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় আসবার কাহিনী। তাঁর ভাষণে সারা বিশ্বের চিন্তা-জগতে কি এক আলোড়নই না সৃষ্টি হয়েছিল। বার বার মনে হতে লাগল তাঁর কত কষ্টই না হয়েছিল—শীতে, অনাহারে। আমার তো সে রকমের কোন অভাব নেই। আহারের কথা তো পূর্বেই বলেছি। শীত বস্ত্রের অভাবও নেই।

স্ট্যানলী কেলার নামে একটি ইহুদী ছাত্র দীক্ষা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। সে তার দাদা নীল কেলারের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। তার বাবা ও মা'র বাড়ীতে নিয়ে যেয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল তাঁদের সঙ্গে।

বাবা ও মা'র সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিল না নীলের। আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকত। এমন কি বাক্যালাপ পর্যন্ত ছিল না পুত্র ও পিতা-মাতার মধ্যে।

নীল শুনল দয়াল ঠাকুরের কথা। যেমনভাবে বললাম সেই-ভাবে চলল কিছুদিন। বাবা ও মা'র সঙ্গে ছিন্ন-সম্পর্ক আবার জোড়া লেগে গেল। মহাখুশি কেলার পরিবারের সকলে।

নীল একদিন ৫০ ডলার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল—মিঃ বিশ্বাস, তোমার শীতবস্ত্র দরকার। তাছাড়া তোমাকে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বা প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। এই টাকা দিয়ে একটা পছন্দ মত ভাল ওভার-কোট কিনে নিও।

স্ট্যানলী আমায় বলল—তুমি যেখানে যেতে চাও আমার গাড়ী ক'রে নিজে তোমায় ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

নিয়েও সে গেল অনেক জায়গায়। স্টনীব্রুক বিশ্ববিগ্যালয়, প্র্যাট বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলাম স্ট্যানলীর গাড়ী ক'রে। লেজার পিরিওডে হানা দিলাম ছাত্রদের আড্ডাখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাঞ্চরুমে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত একজন বা দুজন তরুণীর নাকের ডগায় নাক ঠেকিয়ে লাঞ্চ খেতে। যাকে দেখে মনে হল এ-দুনিয়ায় কেউ নেই তার, নিঃসঙ্গ জীবনের কি এক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইছে চারিদিকে আর আন-মনা হয়ে "স্যাণ্ডউইচে" কামড় বসাচ্ছে—তার পাশে যেয়ে বসলাম। আলাপ হল বেশ কিছুক্ষণ! কপোত-কপোতীদের সঙ্গেও যে আলাপ হলো না তা নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।—যদিও দীক্ষার সংখ্যা বাড়তে লাগল।

স্বামী বিবেকানন্দের সময়কার আমেরিকা আর আজকের আমেরিকার মধ্যে প্রায় ছয় যুগের ব্যবধান। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এদের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের পাল্লা প্রভৃতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। আজকের আমেরিকায় শতকরা আশিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। "হিন্দু" শব্দ শুনে যারা চমকে উঠত তাদের বংশধররা হিন্দু ধর্মে তিনজন ঈশ্বর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—কেন, এই নিয়ে গবেষণা করে। সুতরাং সেদিন যে কথা বললে এরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকত আজ তারা তার চাইতে অনেক বেশী জানে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে এইভাবে। সকালে বেরিয়ে যাই আর রাত্রে ফিরি, কখনও বা পরের দিন সন্ধ্যায়। সঙ্গে সামান্য কিছু চাল ও মুসুরীর ডাল রেখে দিই। কখনও ইউনিভার্সিটির লাঞ্চরুমের বিরাট ওভেনের পাশে বসিয়ে রাখি চাল-ডাল মেশান একটা সস্-প্যান। ফুটে উঠলে নামিয়ে নিয়ে তাতে ফেলে দেই একদলা মাখন। এইভাবে সংক্ষেপে সেরে নেই মধ্যাহ্ন বা নৈশ

ভোজ। কিন্তু যাই করিনা কেন – এ যে ফাঁকা মাঠে গোল দেবার মত অবস্থা। বাস্তবে তো কিছুই করতে পারলাম না। দুঃখ, হতাশা ও গ্লানির ভারে অবসন্ন হয়ে আসে দেহ-মন। রাস্তায় চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ি কোন গাছে হেলান দিয়ে।

সেদিন বেলা পাঁচটা। এমনই এক অবসন্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর দিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো ডাইরেকটরীতে – "রিলিজিয়াস্ সেন্টার ইন ওয়াশিংটন স্কোয়ার নর্থ।" সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস্ সেন্টার যখন, তখন সেখানে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মসম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কোন ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছে।

হাঁটতে-হাঁটতে এসে হাজির হলাম রিলিজিয়াস্ সেন্টারের কটকের সম্মুখে। সিঁড়ির ওপরে ব'সে আপন মনে বই পড়ছে এক তরুণ ভারতীয় যুবক। "Excuse me please" বলতেই মুখের ওপর থেকে বইখানা সরিয়ে আপ্যায়নী ভঙ্গিতে বলল 'হ্যালো'।

পরিচয় দিলাম আমার। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে বুঝি কোন্ এক কতকালের চিরন্তন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। তাই মুহূর্তে আপন করে নিল আমাকে। নাম তার বিভোধ, জেড্. জে. আনন্দ (Vibodh Z. J. Ananda)। তবে আনন্দ নামেই পরিচিত সবার কাছে। উত্তর প্রদেশের কোন এক শহরে আনন্দের বাড়ী। তার মা ও বাবা উভয়েই থাকেন আমেরিকাতে। মা অধ্যাপিকা ও বাবা কোন এক এপিস্কোপালিয়ান চার্চের বিশপ্। বংশপরিচয়ে জানা গেল মূল বিপ্রের ধারা আছে ধমনীতে। তবে আনন্দের পিতামহ কি প্রপিতামহ ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন কন্যার পাণী-গ্রহণ করেছিলেন।

আমার আসবার উদ্দেশ্য, কতদূর কি প্রচেষ্টা করেছি ইত্যাদি সবই সংক্ষেপে বললাম আনন্দকে। আরও জানালাম ভিসা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের একটি মাত্র উপায়ই আছে। তা' হচ্ছে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। ছাত্র হতে পারলে ভিসাকে "টুরিষ্ট" স্ট্যাটাস্

থেকে "স্টুডেন্ট" স্ট্যাটাসে পরিবর্তন করে এদেশে বেশ কিছুদিন থাকা যেতে পারে।

কিন্তু নিউইয়র্ক, কলাম্বিয়া, সোসাল স্কুল, প্র্যাট, স্টনী ব্রুক প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখলাম। আমার পক্ষে ছাত্র হওয়া আকাশ-কুসুম। আমার ম্যাট্রিক, আই.-এস-সি. বি. এস-সি ও এম. এ-তে যা রেজাল্ট তাতে স্কলারশিপের বা ফ্রী-স্টুডেন্টশিপের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। তাছাড়া সে-ধরনের কোন ব্যবস্থা নাইও এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রকে অর্থ ঋণ দেওয়া হয়। পাশ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করে সেই ঋণ যাতে সহজে শোধ দিতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। আর আছে বিভিন্ন "ফাউণ্ডেশান" যারা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য স্কলারশিপ দিয়ে থাকে মেধাবী ছাত্রদের।

আর একটা সহজ ব্যবস্থা আছে—যারা কায়িক পরিশ্রম করতে পারে তাদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে যে-কোন কাজ করলে টিউশন ফী মকুব হতে পারে। অবশ্য কাজের বদলে পারিশ্রমিক যে পাওয়া যাবে না তা নয়।

কিন্তু আমার পক্ষে যে কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়। এদেশের নাগরিক না হলে ঋণ-এর জন্য আবেদন করার অধিকার নেই। আর চাকরী সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশ্বাস দিলেও কাছ থেকে ওয়ার্ক পারমিট (work permit) পাওয়া যাবে না—যতদিন-না একটা সিমেষ্টার পাশ না করছি একটা সিমেষ্টারের মাইনে লাগবে প্রায় একহাজার ডলার! র জীবনে আধমণ তেলও জুটবে না আর রাধার নাচও দেখা যাবে না! কোথায় পাব এক হাজার ডলার!

আনন্দ একটু থামিয়ে দিয়ে বলল, টাকার জোগাড় হলেও যে admission (ভর্তি) পাওয়া যাবে তার তো কোন স্থিরতা নেই!

আমি জানালাম—সেদিন আমাদের গুরু ভাই Mr. E. J. Spencer হঠাৎ আমায় বললেন, তোমার টিউশন ফী দিলে তুমি admission

পাবে কিনা—চেষ্টা করে দেখ! তিনি আমায় পনের ডলার দিয়েছিলেন form fill up করার ফী হিসাবে। International Student Centre-এ ফর্ম জমা দিতে গেলাম। কিন্তু Asst. director, Mr. Durak আমার ফর্ম গ্রহণই করলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি ট্যুরিষ্ট। তোমাকে ভর্তি হতে হলে U. S. A.-এর বাইরে থেকে apply করতে হবে।' আমাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিলেন। আনন্দ অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনলো আদ্যোপান্ত বিবরণ। বলল—তুমি এক কাজ কর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Education-এর 'Religious Education' বিভাগের Chairman হচ্ছেন Dr. Lee A. Belford. তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর। দেখ তিনি যদি কোন রকম সাহায্য করতে পারেন!

পরের দিন ফোনে কথা বললাম ডঃ বেলফোর্ডের সঙ্গে। তাঁর ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে চাই শুনে খুশি হলেন তিনি। বললেন, আজই ইউরোপে ফ্লাই করছি। তুমি Deputy Chairman Dr. Thomson-এর সঙ্গে দেখা কর।

যথাসময়ে ডঃ থমসনের সঙ্গে দেখা করলাম। পি. এইচ-ডি হতে গেলে দুই বছর ধরে কোন্-কোন্ বিষয় পড়তে হবে, কোন্ কোন্ পরীক্ষা দিতে হবে, কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে তার যে ফিরিস্তি দিলেন তাতে মনে হল এ এক দুস্তর সমুদ্র। এ সমুদ্র পার হওয়া শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব।

ডঃ থমসন্ বললেন, প্রত্যেক 'ডক্টোরাল স্টুডেন্টকে G. R. E. (Graduate Record Examination) পরীক্ষা ও তার সঙ্গে "essay" (comprehensive) examination দিতে হবে। এই পরীক্ষায় পাশ করলে ছাত্রকে "Matriculated" বলে ঘোষণা করা হবে। বিদেশী 'কালচার' থেকে যে-সব ছাত্র আসে তাদের কেউই এই G. R. E. পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে বিদেশী ছাত্রদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা আছে।

তাদেরকে একটা Board of Examiners-এর সামনে ইন্টারভিউ দিতে হয়। Essay Examination-এর সঙ্গে ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হলে ছাত্রকে Matriculated ঘোষণা করা হয়। Matriculated না হওয়া পর্যন্ত কেউ নির্দিষ্ট credit-এর বেশী course নিতে পারে না। মাতৃভাষা ছাড়া আরও দুটি বিদেশী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। ফরাসী, জার্মান, ল্যাটীন, স্প্যানিস্ প্রভৃতি যে-কোন দুটি ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান যে আছে তার প্রমাণ দিতে হবে।

ডঃ থমসন্ ভর্তি হওয়া থেকে থিসিস্ জমা দেওয়া পর্যন্ত আমার করণীয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিলেন তাতে ভর্তি হবার নেশা মুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। মাথাটা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগল। মনে হ'ল এই পথে নামলেই কাশীর গলির মত গোলক-ধাঁধায় পড়ে তিন বছর ধরে ঘুরপাক খেতে হবে।

ডঃ থমসন্ প্রস্পেক্টস্ ইত্যাদি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "Read it thoroughly and meet me after ten days." (ভাল করে পড়ে দশদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।)

একটু ধার করা হাসি হেসে বললাম, Let me see if I can get admission at all (দেখি আদৌ ভর্তি হতে পারি কিনা)। ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলাম ডঃ থমসনের কাছ থেকে।

আনন্দ বলল, আগে ভর্তি হতে পার কিনা তাই দেখ। পরীক্ষার পথ ভেবে ঘাবড়ে যেও না। ডঃ থমসনের সঙ্গে আর দেখা ক'রে লাভ নেই। বরং ডঃ বেলফোর্ড ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যে থিসিস্ সাবমিট করেছিলে তার কপি যদি ডঃ বেলফোর্ডকে দেখাতে পার তাহলে খুব ভাল হয়।

চমকে উঠলাম আনন্দের কথায়! মনে পড়ে গেল, আমেরিকায় রওনা হবার চারদিন আগে হঠাৎ শ্রীশ্রীবড়দা আমায় ডেকে বললেন, "রেবতী তোর ক্যালকাটার থিসিস্‌টা সঙ্গে নিয়ে যাস্!"

আমি যাচ্ছি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের কাজে। হঠাৎ

তাদেরকে একটা Board of Examiners-এর সামনে ইন্টারভিউ দিতে হয়। Essay Examination-এর সঙ্গে ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হলে ছাত্রকে Matriculated ঘোষণা করা হয়। Matriculated না হওয়া পর্যন্ত কেউ নির্দিষ্ট credit-এর বেশী course নিতে পারে না। মাতৃভাষা ছাড়া আরও দুটি বিদেশী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন, স্প্যানিস্ প্রভৃতি যে-কোন দুটি ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান যে আছে তার প্রমাণ দিতে হবে।

ডঃ থমসন্ ভর্তি হওয়া থেকে থিসিস্ জমা দেওয়া পর্যন্ত আমার করণীয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিলেন তাতে ভর্তি হবার নেশা মুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। মাথাটা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগল। মনে হ'ল এই পথে নামলেই কাশীর গলির মত গোলক-ধাঁধায় পড়ে তিন বছর ধরে ঘুরপাক খেতে হবে।

ডঃ থমসন্ প্রস্পেক্টস্ ইত্যাদি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "Read it thoroughly and meet me after ten days." (ভাল করে পড়ে দশদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।)

একটু ধার করা হাসি হেসে বললাম, Let me see if I can get admission at all (দেখি আদৌ ভর্তি হতে পারি কিনা)। ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলাম ডঃ থমসনের কাছ থেকে।

আনন্দ বলল, আগে ভর্তি হতে পার কিনা তাই দেখ। পরীক্ষার পথ ভেবে ঘাবড়ে যেও না। ডঃ থমসনের সঙ্গে আর দেখা ক'রে লাভ নেই। বরং ডঃ বেকফোর্ড ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যে থিসিস্ সাবমিট করেছিলে তার কপি যদি ডঃ বেলফোর্ডকে দেখাতে পার তাহলে খুব ভাল হয়।

চমকে উঠলাম আনন্দের কথায়! মনে পড়ে গেল, আমেরিকায় রওনা হবার চারদিন আগে হঠাৎ শ্রীশ্রীবড়দা আমায় ডেকে বললেন, "রেবতী তোর ক্যালকাটার থিসিস্টা সঙ্গে নিয়ে যাস্!"

আমি যাচ্ছি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের কাজে। হঠাৎ

থিসিস্ সঙ্গে ক'রে নিতে বলছেন কেন? ভেবে পেলাম না! তবুও তাঁকে কোন প্রশ্ন করলাম না। গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করব বলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় যে সঙ্কল্প করেছিলাম তা পালন করার চেষ্টা করি প্রাণপণে। ইষ্ট ও পরম আরাধ্য দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের লৌকিক লীলা সম্বরণের পর যিনি সর্বতোভাবে তাঁকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন, যাঁর জীবনের প্রতিটি অণুপরমাণু ইষ্ট-রসাপ্লুত হ'য়ে সর্বদা তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় মগ্ন হয়ে আছেন সেই পরম-পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবড়দাই যে আমার জীবন্ত পরিচালক (living guide) সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন প্রশ্নই ওঠেনি কোনদিন। তাই বিনা দ্বিধায় সঙ্গে এনেছিলাম সেই সোয়া কিলো ওজনের থিসিসখানা।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস্ পড়তে যেয়ে টিউশন ফীর টাকার অঙ্ক চোখে পড়তেই চোখ দুটি ছানা-বড়া হয়ে গেল। প্রত্যেক "ক্রেডিটে" পঁচাত্তর ডলার হিসাবে মোট ৪৮ Credit-এ ৩৬০০ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ত্রিশ্ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। এত টাকা পাব কোথায়? ভাবতে-ভাবতে রক্তের চাপ কোন সময় নেমে গেছে স্বাভাবিকের নীচে!

ভর্তি হবার প্রচেষ্টা মনে-মনে পরিত্যাগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভবঘুরের মত!

আজ ডঃ থমসনের সঙ্গে দেখা করার দিন! কি হবে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে? এ-দেশে পি. এইচ্. ডি. করা আমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মত দুরাশা!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পার হয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছি উত্তর দিকের রাস্তা ধরে। কে যেন বার-বার বলছে—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?"

মাথার কাছে ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠলে ঘুমের ঘোরে ডান হাতখানা যেমন আপসে যেয়ে পড়ে ঘড়ির অ্যালার্ম-সুইচের ওপরে,

ঠিক তেমনই চাপা দিচ্ছি মনের মধ্যে জাগ্রত কবির কাব্যোক্তিকে। ব্যাঙ্গ করে বলছি—কবি তুমি যদি আজ এই পরিস্থিতিতে পড়তে তাহলে তুমি শুধু ক্ষান্তই হতে না, জ্যান্ত উঠে পড়তে মনোরথে, এখনই উড়ে চলে যেতে দেশের মাটিতে। কিন্তু আমার যে সে-উপায়ও নেই।

হঠাৎ মনে হচ্ছে কে যেন ঠেলছে আমার পেছন থেকে। কে যেন বলছে : কথা যখন দিয়েছ তখন ডঃ থমসনের সঙ্গে দেখা করতে দোষ কী ! 'যাই' "যেয়ে কি হবে ?" এই দ্বন্দ্বের দাপটে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি স্কুল অফ রিলিজিয়াস্ এডুকেশন-এর মেন গেটে। কোন্ সময় উঠে পড়েছি লিফ্‌টে।

সপ্ততলে এসে দাঁড়াল লিফ্‌ট্। আমাকে যে এই তলে নামতে হবে তা খেয়াল নেই। লিফ্‌টম্যান বলছে, seventh floor please.

আমার হুঁস হলো, আমিই তো সপ্ততলার খরিদ্দার। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে নেমে গেলাম লিফ্‌ট্ থেকে।

বিমনা হয়েই ঢুকে পড়েছি ডঃ থমসনের ঘরে। আসব বলে আসিনি। অথচ দেখছি এসে পড়েছি। ডঃ থমসন্ বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে আমি মেন্টালী ডিস্টার্বড্। তাই শশব্যস্ত হয়ে বললেন—"Have a seat Mr. Biswas. Are you all right ?" (বসো মিঃ বিশ্বাস ! তুমি সুস্থ আছ তো ?)

ডঃ থমসন্ সবে তাঁর কথা শুরু করেছেন। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "Hallo ! Mr. Biswas, O K. ? Dr. Thomson, send him to me soon. (হ্যালো মিঃ বিশ্বাস ! ঠিক আছে ? ডঃ থমসন তুমি তাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।)

বুঝলাম ইনিই ডঃ লী. এ. বেলফোর্ড। ডঃ থমসনের মুখে শুনলাম যে ডঃ বেলফোর্ড তাঁর ট্যুর প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে হঠাৎ ফিরে এসেছেন স্টেটে ! ডঃ থমসনের ইঙ্গিতে উঠে গেলাম ডঃ বেল-

ফোর্ডের ঘরে। ডঃ বেলফোর্ড উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে স্বাগত জানিয়ে বসতে বললেন।

আমার সব কথা শুনে বললেন, "What can I do for you Mr. Biswas (মিঃ বিশ্বাস আমি তোমার জন্য কী করতে পারি) ?

আনন্দের পরামর্শমত বললাম, "If you please give me a letter of recommendation, that may help my admission in the New York University. (আপনি যদি আমায় দয়া করে একখানা সুপারিশ পত্র দেন তা'হলে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সুবিধা হ'তে পারে)।

ডঃ বেলফোর্ড সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখলেন Inter-National Student Centre-এর Director Miss Pratt-এর কাছে। Stenographer টাইপ করে এনে দিল। নিজে signature করে বললেন, 'I wish you success'. (তুমি কৃতকার্য হও এই আশা করি।) আনন্দ, ডঃ বেলফোর্ডের চিঠি খানা পড়ে বলল, তুম্ মার দেয়া কেল্লা ! একটা ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষের কাছ থেকে এর চাইতে strong recommendation আর হয় না। তিনি লিখেছেন "......I want to have Mr. Biswas in my department of Religious education (আমার রিলিজিয়াস এডুকেশন বিভাগে মিঃ বিশ্বাসকে পেতে চাই।)

কিন্তু দশদিন চেষ্টা করেও I. N. S. C.-এর ডাইরেকটর মিস্ প্র্যাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল না। ২০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে তিনি কোন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করবেন না।

অগত্যা সহকারী ডাইরেকটর মিঃ হেনরী ডুক্কাকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার admission form জমা নিতেই রাজী নন। তাঁর ঐ একই কথা : Your credentials are very poor. moreover you came here as a tourist, now you want to be a student. What is the motive behind it (তোমার প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফল অত্যন্ত পুওর ! তাছাড়া

তুমি টুরিষ্ট হিসাবে এসে ছাত্র হতে চাচ্ছ, এর পেছনে অন্য কোন্ উদ্দেশ্য আছে ?)

মিঃ ডুরাককে অনেক বুঝিয়ে বললাম, অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই! আমার গুরুর আদেশ ও ইচ্ছা ছিল আমি যেন ডক্টরেট লাভ করি। তাই চেষ্টা করছি।

ভদ্রলোক তার গোঁ ছাড়লেন না। আমি আরও বিনীতভাবে বললাম—'I pray you to consider my case.'

ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে টেবিলে চপেটাঘাত ক'রে গলা ফাটিয়ে বলে উঠলেন—'Stop praying. Praying will not yield anything here.' (তোমার প্রার্থনা থামাও। প্রার্থনাতে চিড়ে ভিজবে না।)

মিঃ ডুরাকের মুখঝামটা খেয়ে আমি হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে গেলাম। আমার চোখে-মুখে ফুটে উঠল দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। গম্ভীর কণ্ঠে বললাম—"Mr. Durak, you have to accept my admission form. You don't know whom you. are refusing today. I have come to you not at my own will. It is the will of Supreme Father, my Thakur that has sent me here. (মিঃ ডুরাক, আমার ভর্তির আবেদনপত্র আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। আপনি জানেন না আজ কাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন! আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আপনার কাছে আসিনি। এটা আমার পরমপিতা -আমার ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি এখানে এসেছি।)

প্রায় আট মিনিট ধ'রে নাকি অনর্গল কি সব বলেছি। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন দেখি ছয়-সাত জন তরুণী সেক্রেটারী মিঃ ডুরাকের চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে আমাকে। মিঃ ডুরাক কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছেন আমার দিকে। হঠাৎ ব'লে উঠলেন—'All right. I shall accept the form but not the fee of dollar fifteen.' (ঠিক আছে। আমি তোমার

আবেদনপত্র গ্রহণ করছি। কিন্তু ১৫ ডলার ফী নেব না)। বিনা ফীতেই admission form ও আনুসঙ্গিক কাগজ জমা দিয়ে বেরিয়ে এলাম মিঃ ডুরাকের চেম্বার থেকে।

দিন দশেক পরে ইউনিভার্সিটির I. N. S. C.-থেকে পত্র পেলাম : ······"The Committee on Admission has determined that your qualifications do not meet all the requirements for admission to New York University. Consequently we regret to inform you that we are unable to offer you admission·········" (কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে তোমার যোগ্যতা নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আমরা দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে তোমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অক্ষম।)

সমস্ত প্রচেষ্টার যবনিকা পড়ে গেল। আনন্দ বিমর্ষ হয়ে বলল, Admission Committee নাকচ করে দিলে আর কোন উপায় নেই। বিদেশী ছাত্রদের ব্যাপারে International Student Centre-ই সর্বেসর্বা। তবে ডঃ বেলফোর্ডের ঐ-রকম একখানা চিঠির মর্যাদা দিল না এইটাই বিচিত্র।

ডঃ বেলফোর্ডও দুঃখ প্রকাশ করে বললেন "What can I do Mr. Biswas You better try in other university." (আর আমি কি করতে পারি বল। তুমি বরং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা কর।)

অবসন্ন দেহে ফিরে এলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টে। শরীর যেন আর চলছে না। ভর্তি হতে পারলে ভিসা extend ক'রে এদেশে থাকবার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাও বিলীন হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলাম, ঠাকুর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমায় সাহায্য করার। দয়াল! আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি কিছু একটা না ক'রে কোন মুখে দেশে ফিরে যাব। তোমার ইচ্ছা ও আদেশ

আমার জীবনে পূর্ণ করিয়ে নাও! হে দয়াল! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

পাঁচতলার ওপরে sound-proof wall ভেদ করে সে শব্দ পৃথিবীর আর কারও কানে পৌঁছানর কোন সম্ভাবনা নেই। যদি শোনেন তবে সর্বশ্রোতা দয়ালই শুনবেন আমার ভগ্ন হৃদয়ের এই ব্যাকুল প্রার্থনা।

কি যে করব তা ভেবে পাচ্ছি না। এমন একটা লোক নেই যার কাছে আমার দুঃখের কথা বলে মনটাকে হালকা করি।

ডায়েরীখানা খুলে তার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীবড়দার শ্রীহস্ত লিখিত আশীর্বাদটি বার-বার পড়লাম:

"ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাই তোমার জীবনের ব্রত হ'ক, সুখী হও, সবাইকে সুখী কর।"

চোখের সামনে ভেসে উঠল শ্রীশ্রীবড়দার স্নেহ-সজল চোখ দুটি। মনে হলো তিনি হয়তো কত আশা করেই না বসে আছেন তাঁর এ দীন সেবক দয়ালের ইচ্ছা পূরণ করে ফিরে আসবে।

আরও তিনদিন কেটে গেল। গতানুগতিকভাবে রাস্তায় ঘুরে-ফিরে এসেছি অ্যাপার্টমেন্টে। সন্ধ্যাপ্রার্থনা শেষ করে উঠতেই টেলিফোন বেজে উঠল। আনন্দ ফোন করেছে: 'রেবতী এখনই দেখা কর আমার সঙ্গে। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। তোমার ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে।'

রাত্রি আটটায় দেখা করলাম আনন্দের সঙ্গে। Religious Centre-এর চারতলায় তার কোয়ার্টার ও অফিস দুই-ই। সে হচ্ছে Religious Centre-এর ম্যানেজার। কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে সাদর অভ্যর্থনা করে বলল—"Halloo, Rebati! Don't worry. Let us see what Thakur does. Have a seat. (রেবতী! দুশ্চিন্তা করো না। দেখা যাক্ ঠাকুর কি করেন। ব'সো)।

চা-এর পালা শেষ ক'রে বলল আনন্দ—"ভক্তি হবার সমস্ত পথ

তো বড়ই। তবুও একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি! আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Prof. Florence Downes আছেন। তিনি হচ্ছেন Ombudsman. তাঁর কাজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করা। তুমি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র নও। তোমার কেস্ তাঁর হাতে নেবার কথা নয়। তবুও তাঁর সঙ্গে interview request (সাক্ষাৎ প্রার্থনা) করে এই পত্র লিখেছি!"

New York University Interfaith
Council/Religious Centre,
2, Washington Square North,
New York 3.
September 28, 1970.

Prof. Florence S. Downes,
Ombudsman, School of Education.
51, South Building.

Dear Prof. Downes,

I don't know if this reqest is the kind, that should be undertaken by the "Ombudsman", if it is not, please let me know, and we will cancel our appointment on October 6th, at 4 o'clock.

I have been approached in my capacity as the representative of the Department of Religious Education to the Graduate Students' Organisation to introduce Mr. Biswas to you. He is seeking admission to she department for the spring of this academic year.

The problem which has been expressed to me is this—Mr. Biswas has seen Dr. Belford (Cairman,

Dept. of Rel. Ed.) who is quite willing to have Mr. Biswas in the Department. However, the International Student Centre, which processes all foreign applications to the University has denied his admission.

There has always been a tension between foreign students and the evaluation of their credentials by the University. Being a student from abroad myself, I have particular empathy with this situation which has come to my notice, and would be grateful if you could see both Mr. Biswas and myself on October 6th to discuss Mr. Biswas problem.

Sincerely
Vivodh Z. J. Acanda
Resident Manager.

নির্দিষ্ট দিনে Prof. Downes-এর সঙ্গে আনন্দ ও আমি দেখা করলাম। দীর্ঘাঙ্গী শ্বেতকায় মহিলা মৃদু সম্ভাষণে করমর্দন করে বললেন, "Halloo Mr. Biswas. It is nice to meet you." (হ্যালো মিঃ বিশ্বাস। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই আনন্দের)।

Prof. Downes ধৈর্য্য সহকারে আমার সব কথা শুনে বললেন "I will try my best. Let me see what can I do You please meet after three days. (আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দেখি আমি কি করতে পারি। তুমি তিন দিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।)

ইউনিভারসিটির চিঠিখানা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস্ যে জমা দিয়েছিলাম তার রসিদ প্রভৃতি ও ডঃ বেলকোর্ডের আর একখানা চিঠি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি ২ মিনিটের মধ্যে তাঁর office-এ

ঢুকে ঐগুলির duplicate করে নিয়ে এলেন "Xerox" মেশিনে। Original paperগুলি আমাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। ডঃ বেলফোর্ডের চিঠিখানা আর একবার পড়লেন Prof. Downes.

New York University
School of Education
Department of Religious Education. 737 East Building.

October 12 1970

To Whom It May Concern :

This is to certify that I have had a number of conversations with Rebati Mohan Biswas and have been impressed by his knowledge of Indian Religious thought. I have also read a thesis and a small book which he wrote. He has deep interest in doing further work to increase inter-religious unnderstandiug and has a good background for such work. He has applied for admission to New York University through the International Students Centre. Should he be accepted we would like to have him as a doctoral student in our department…

Lee A Belford. Chairman
Department of Religious Education.

(রেবতী মোহন বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। আমি তার ভারতীয় ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি তার লেখা থিসিস্ ও বই পড়েছি। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ধর্মবোধকে আরও প্রসারিত করবার জন্য তার গভীর আগ্রহ আছে। এবং একাজ করার মত যথেষ্ট অনুরাগও

তার আছে। আন্তর্জাতিক ছাত্রসংস্থার কেন্দ্রের মাধ্যমে সে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করেছে। সে যদি ভর্তি হবার জন্য অনুমতি পায় তাহলে তাকে আমরা আমাদের বিভাগে ডক্টোরাল ছাত্র হিসাবে রাখতে চাই।

আরও দু'দিন কেটে গেল। কিন্তু Prof. Downes-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার যে এমন ধন্বন্তরীর মত কাজ করবে তা আনন্দ ভাবতে পারে নি।

এ যেন জলে ভাসে শিলা! ইন্টারন্যাশানাল স্টুডেন্ট সেন্টারের ডাইরেক্টর ফোন করছেন: Halloo Mr. Biswas. Please see Miss Platon, Asst. Director this afternoon (অনুগ্রহ করে আজ বিকালে সহকারী ডাইরেক্টর মিস্ প্ল্যাটনের সঙ্গে দেখা কর)।

Miss Platon-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে Mr. Downes-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন: "I called for an explanation, and asked to show me what qualification Mr. Biswas does not have for which he has been refused admission in this university,........ take Ananda with you. Show them all the documents that you presented before me. (আমি কৈফিয়ৎ তলব করেছিলাম—আমাকে জানাও যে মিঃ বিশ্বাসের কোন্ যোগ্যতার অভাব, যার জন্য তাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল না।......আনন্দকে তোমার সঙ্গে নিও। আমাকে যে সব কাগজপত্র দেখিয়েছ তা সব তাদেরকে দেখিও।)

যথাসময়ে Miss Platon-এর সঙ্গে দেখা করলাম। Miss Platon একটা শুকনো হাসি ছড়িয়ে বললেন—'Have a seat'.

Miss Platon-এর সামনেই ছড়ান আছে আমার দরখাস্ত ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র—যা মিঃ ভুরাকের কাছে জমা দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে রাগ ও আহত

অহং-এর জ্বালা। যে দরখাস্ত নাকচ্ করা হয়েছে তাই আবার স্থপারিশ করতে হবে! সহ্য করতেও পারছেন না আবার "না" বলার ক্ষমতাও নেই। "Ombudsman" Dr. Downes কড়া মন্তব্য করেছেন—যে লোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-লিটের থিসিস্ সাবমিট করেছে, যাকে ডঃ বেলফোর্ডের মত লোক রেকমেণ্ড করেছেন তাঁতে "Your qualifications do not meet all the requirements" কথাটা লেখা অন্যায় হয়েছে। Miss Platon কোন জবাবও দিতে পারেন নি আবার বলতেও পারেন নি যে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তাই গজ্ গজ্ করে বললেন—We do not cosider the master Degree of Calcutta University. You would have to take Master Degree course again here. We recognise the degrees conferred by only the I. I. T.'s in India. However we are recommending your application to the internal admission office. You better sit for the English proficiency test and submit the result tommorrow. (আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রি (স্নাতকোত্তর উপাধি) বিবেচনা করি না। এই দেশে আবার তোমাকে মাষ্টার ডিগ্রী (M. A.) নিতে হবে। আমরা ভারতবর্ষের শুধু I. I. T. এর ডিগ্রীকে স্বীকার করি। যাহোক, আমরা তোমার আবেদন-পত্র স্থপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্দেশীয় ভর্তি বিভাগে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সী টেষ্ট পরীক্ষা দাও এবং আগামীকাল তার ফলাফল আমাদের এখানে জমা দিও। আমি বললাম—আমি একজন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশের এম.এ। আমাকেও ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সী টেষ্ট দিতে হবে?)

সজোরে বললেন Miss Platon—"Of course" (অবশ্যই)! তাঁর রাগ প্রথমতঃ মিঃ ডুরাকের ওপরে। ডঃ বেলফোর্ডের মত একজন বিভাগীয় অধ্যক্ষের চিঠি তাঁর কাছে পাঠান হয়নি। দ্বিতীয়তঃ

Dr. Downes-এর ওপরে। বিদেশী ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে একজন 'Ombudsman'-এর কৈফিয়ৎ তলব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম! Miss Platon যথাসময়ে আমার admission form ইত্যাদি সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিলেন ইউনিভার্সিটিতে।

আট-দশ দিন কেটে গেল। মন অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে—ভর্তি হতে পারব ভেবে।

ওয়াশিংটন স্কোয়ারে ঘুরতে-ঘুরতে কি খেয়াল হ'ল উঠে গেলাম আনন্দের কোয়ার্টারে। দেখি আনন্দ নিরানন্দ হয়ে বসে আছে। বলল--বিশ্বাস আমাদের শেষ প্রচেষ্টাও বুঝি বানচাল হতে চলেছে।

"আবার কি হল" ব'লে ব'সে পড়লাম আনন্দের সামনের সোফাতে। মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। আমার নিজস্ব ক্ষমতা যখন কিছুই নেই, সবই সঁপে দিয়েছি দয়াল ঠাকুরের ইচ্ছার ওপরে, তখন আর চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি?

আনন্দ জানাল—সবই অহং-এর খেলা। "Ombudsman" কৈফিয়ৎ তলব করায় বাবুদের অহং আহত হয়েছে। বিদেশী ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে তাদের "সুপ্রীমেসী"-এর গায়ে হাত পড়েছে। মিঃ ডুবাক্ জঘন্য ভাষায় চিঠিতে ও ফোনে দোষারোপ করেছে ডাঃ বেল-ফোর্ডকে—কেন তিনি তোমাকে রেকমেণ্ড করেছেন। এইমাত্র Prof. Vera Zorne আমাকে জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন। আমার ওপর ভীষণ রাগ। তিনি আমাকে চার্জ করলেন আমি কেন একজন ট্যুরিষ্টকে "Ombudsman"-এর কাছে নিয়ে গেছি। Prof. Vera Zorne হচ্ছেন Foreign students co-ordinator. সর্বশেষে তাঁর অনুমোদন লাগবেই। তোমার পেছনে আর্থিক সংহতি নেই ইত্যাদি বলে admision নাকচ করার ভয় দেখালেন। আমিও কড়া ভাষায় বলছি—If Mr. Biswas is refused his admission, the University will suffer a great loss of contribution. The Man whose conception he has carried on here is the redeemer of mankind!

(মিঃ বিশ্বাসকে যদি অ্যাডমিসন্ না দেওয়া হয়, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এক বিরাট অবদান থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ তিনি যাঁর জীবনদর্শন বহন ক'রে এনেছেন তিনি হচ্ছে মানুষের পরিত্রাতা।)

—আনন্দ আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—দুঃখ করো না। Prof. Downes-ই ছিলেন শেষ ভরসা। তাঁর প্রচেষ্টাও যখন এতদূর এগিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল তখন আর কি করা যাবে! এবারে দেশে ফেরার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর কি!

"শুভ কাজে শতেক বাধা" শুনেছি। কিন্তু এ যে লক্ষ বাধা! এ বাধা খণ্ডন করার মত আর কোন অস্ত্রই নেই আমার হাতে।"

বেরিয়ে পড়লাম আনন্দের ঘর থেকে। কোন দিকে, কোথায়, কার কাছে যাব ভেবে পাচ্ছি না। অন্তর মোচড় দিয়ে কান্নার ঢেউ বেরিয়ে আসতে চাইছে। পার্কের এক কোণে একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম ধপ্ করে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। দয়াল তুমি কোথায়? আমি আর তো লড়াই করতে পারি না ঠাকুর। তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না—শুধু চাই তোমার আদেশ পালন করতে।

কতক্ষণ হাউ-হাউ করে কেঁদেছি কে জানে! ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর বাঁশীর মর্মভেদী আওয়াজে খেয়াল হতে তাকিয়ে দেখি রাস্তায় একটাও লোক নেই। শুধু মার্কারী-ল্যাম্পগুলি তাকিয়ে আছে—আমার মর্মবেদনায় সহানুভূতি জানাতে। ছম্ ছম্ ক'রে উঠল শরীরের মধ্যে। ভূতের ভয় নেই। তবে এই নির্জন পল্লীতে কারণ-বারির বোতল বগলে নিয়ে শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গ 'হোমোরা' ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়। তাদের সাহস যে বেশী তা নয়। তবে তাদের কামনার জ্বালা মেটাবার পথে বাধা দিলে গুলি ক'রে দিতে পারে অনায়াসে। রিভলভার-এর জন্য কোন সরকারী লাইসেন্স লাগে না। গুলিরও অভাব নেই এদেশে। চারিদিক একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে 'নাম' করতে করতে রওনা হলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

আরও সাত দিন কেটে গেল এইভাবে। অপেক্ষা করছি স্পেন্সারদার ফিরে আসা পর্যন্ত। তিনি পেনসিলভ্যানিয়াতে গেছেন তার কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। দেখি তিনি আমার ভারতে ফিরে যাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কি না?

রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ মনে হল, দেখিনা Admission office-এ একটা ঢুঁ মেরে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। অফিসে ঢুকতেই একজন তরুণী বলল—"May I help you?"

আমার পরিচয় দিয়ে বললাম—'আমার Admission-এর ব্যাপারে কি হল তাই জানতে এসেছি'।

তরুণী চট্ করে পাশের ঘরে চলে গেল। খামে আঁটা দুখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বলল—"We were going to post it to you today. (আজই তোমার কাছে ডাকে পাঠাতাম)।

"ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম চিঠি দুখানা নিয়ে। প্রথম চিঠিখানায় যা লেখা ছিল তার অর্থ:

প্রিয় মিঃ বিশ্বাস!

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তোমাকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-অব-এডুকেশন-এর ১৯৭১ সালের স্প্রীং-সীমেষ্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

তোমাকে পি. এইচ্. ডি. কোর্সে রিলিজিয়াস্ এডুকেশন বিষয়ে পড়বার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম শেষ করার জন্য অন্ততঃ পক্ষে তিন বৎসর (এই দেশে) থাকবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে পড়লাম। তার নির্দেশমত প্রথমে Preliminary Advisor Dr. Hug ও পরে Programme Adviser Dr. Belford-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমার দ্বারা সই করিয়ে নিজেরাও সই করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। Dr. Belford খুবই খুশি

হয়েছেন। করমর্দন ক'রে "Congratulation" জানিয়ে বললেন—"Now you meet Prof. Vera Zorne.

Prof. Zorne-এর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিতেই তিনি বলে উঠলেন—You are not admitted : আমি তো হতবাক্ !! Admisstton হয়নি ! বলে কি ? চিঠি ছ'খানা তাঁর হাতে দিতেই চোখদু'টি ছানাবড়ার মত ক'রে ফেললেন Prof. Zorne. চশমার ফাঁক দিয়ে চিঠির ওপরে চোখ বুলিয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বললেন—"How do you get this letter ? You are not granted admission. I did not recommend your case." (তুমি কি করে এই পত্র পেলে ? তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়নি ! আমি তোমাকে অনুমোদন করি নাই।)

আমি বললাম—তা আমি জানি না, তবে তোমার Admission office থেকে পেয়েছি।

Prof. Zorne-এর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। চিঠিগুলিকে বাস্তব ব'লে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মুহূর্তের মধ্যে চিঠিগুলি duplicate ক'রে নিয়ে এলেন তাঁর অফিস—কক্ষ থেকে। Original চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন—"Strange ! Some supernatural power is working behind you ! (অদ্ভুত ! কোন দৈবী শক্তি তোমার পেছনে ক্রিয়া করছে) "However, you see Mr. Durak for I-20 form." মিঃ ডুরাকের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন—তুমি I-20 form পাবে না। তোমার admission হয়নি। তোমার চিঠিতে proper person-এর পরিবর্তে অন্য লোকের signature পড়েছে।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলাম "মিঃ ডুরাক, ভারতীয়দেরকে আপনি কি ভাবেন ? আপনি কি মনে করেন তারা আপনার করুণার ভিখারী ? আমি আপনার বাজে কথা শুনতে রাজী নই। আমি উপযুক্ত অফিস থেকে

"ভর্তি অনুমোদনের পত্র পেয়েছি। আমাকে "আই-টুয়েন্টি" (I-20) ফর্ম দিতেই হবে।"

আমার দৃঢ় মনোভাব দেখে মিঃ ডুরাক আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন—চার দিন পরে দেখা করো।

মিঃ ডুরাক আরও তিন-চার দিন আমায় ঘুরপাক খাওয়ালেন নানা অজুহাত তুলে। স্পেন্সারদার sponsoring letter-এ হবে না। যিনি sponsor করবেন তার মাসিক আয়, বাড়ি-ঘর আছে কিনা, ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণসহ sponsoring letter জমা দিতে হবে। তাই করলাম। Mr. Jame Michael নামে আমাদের এক গুরুভাই আমাকে sponsor করলেন। মিঃ ডুরাক I-20 form যথোপযুক্তভাবে seal signature দিয়ে আমায় দিলেন।

আনন্দ ও স্পেন্সারদা দুজনেই ফিরে এসেছেন। আনন্দ খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরে বলল—শেষ পর্যন্ত তোমার ঠাকুরেরই জয়! You have made it ultimately. এখন টাকার ব্যবস্থা কর।

টাকার অঙ্কের কথা খেয়াল ছিল না। চিঠিখানা ভাল ক'রে পড়ে দেখি এক বছরের জন্য ৩৪০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৬,৯০০ টাকা জমা দিতে হবে। অন্ততঃ প্রথম কিস্তি ৬,৬৫০ টাকা জমা দিতে হবে আগামী চার দিনের ভেতরে।

যথাসময়ে স্পেন্সারদাকে বললাম—সব কথা। ভর্তির ব্যাপারে এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী ও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছি শুনে তিনি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—জয়গুরু। Thanks Thakur!

টাকার অঙ্কের কথা বলতেই আলেয়ার আগুন যেমন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে আবার নিভে যায় তেমনই দপ্ করে বসে পড়লেন তাঁর আধা-বাঁকা চেয়ারে। দুই হাতে মুখে ঢেকে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—That I don't know. I can't help

you with a single penny. You better try to collect-the amount.

(তা আমি জানি না। আমি তোমাকে একটা কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করতে পারব না। তুমি বরং টাকাটা সংগ্রহ করার চেষ্টা কর)।

কথাগুলি সহস্র বজ্রপাতের শব্দে আঘাত করল আমার কানে। আর কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছি না আমি ; কী দিলে ভর্তি হতে পার কিনা যখন বলেছিলেন, তখন ভেবেছিলাম হয়তো টাকার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। তাঁর নিজস্ব আয় সামান্য তবে অন্য কোন উৎস থেকে যদি করেন এই গোপন আশা ছিল !

সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না। মাথাটা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। টাকা সংগ্রহ করব কার কাছ থেকে। এখানে কি ভারতবর্ষের সৎসঙ্গী সমাজ আছে? যে কোন প্রয়োজনে একজন সৎসঙ্গী গুরুভাইদের কাছে হাত পাতলে তারা আপ্রাণ সাহায্য করেন প্রয়োজন পূরণে। এই পারস্পরিকতা যা পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন তা জগতের ইতিহাসে বিরল।

এখানে রবার্ট কামিং নামে একজন মাত্র সৎসঙ্গী সারা নিউইয়র্ক শহরে। তাঁর কাছে এত টাকা চাইলে তিনি দেবেন কোথা থেকে। তিনি নিজেই সামান্য আয় করেন মাসে দু-চারটা 'লেখা' লিখে। তাছাড়া তাঁর কাছে চাইব কোন্ মুখে?

টাকার সংস্থানই যখন নেই, তখন অযথা এই দেড় মাস কঠিন সংগ্রাম করলাম কেন? সারা ইউনিভার্সিটিতে তোলপাড় পড়ে গেছে আমার ভর্তির ব্যাপার নিয়ে। যে-কোন অফিসে ঢুকলে young secretary-রা চেয়ে থাকে আমার দিকে। পরস্পর বলাবলি করে—This is Mr. Biswas.

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায়, সাররাত কাটল। পরমদয়ালের উদ্দেশ্যে নিবেদিত চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। নিজের প্রতি ধিক্কার আসল : স্পেন্সারদার কাছে টাকার ব্যাপারটা পরিষ্কার না করে নিয়ে অযথা এত শক্তি ও সময়ের অপচয় করলাম কেন?

টাকার বৃথা চেষ্টা ক'রে কেটে গেল আরও দু'দিন।

সেদিন সকালবেলা! স্পেন্সারদা বেরিয়ে গেছেন কাজে। হরিনারায়ণ স্কুলে। তাদের দুজনের জন্য রান্না করে রেখে দিলাম ওভেনের ওপরে। নিজের খাবার স্পৃহা নেই এতটুকু! সমস্ত শরীর মন অবসন্ন।

স্নান সেরে নিয়ে ঘরের দরজা লক্ ক'রে দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির কাছে মাথা ঠুকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম: দয়াল আমি আর পারি না! তোমার আদেশ পালন না করিয়ে তোমার অধম সন্তানকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেও না! তুমি ছাড়া এ প্রবাসে আর কেউ নেই দয়াল। তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে তোল তোমার এই দীন সেবকের জীবনে!

অনেকক্ষণ কেঁদেছি দয়ালের চরণপ্রান্তে। মেঝের কাঠের ঘর্ষণে ফুটে উঠেছে কপালের অনেক জায়গায়। নিজেই আপসা চোখের জল মুছে শান্ত করলাম নিজেকে। কোনরকমে একমুঠো ভাত মুখে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম হারা উদ্দেশ্যে।

ঘুরতে ঘুরতে এসে বসে পড়েছি পার্কের এক কোণে একটা গাছের তলায়। কোলাহল মুখর পার্ক। কর্মব্যস্ত মানুষের দল পার্কের বিভিন্ন রাস্তা ধরে চলেছে যে-যার কর্মস্থলে। কেউ-বা ঘাসের ওপরে শুয়ে আপনমনে বেহালায় তান ধরেছে। কেউ-বা কপোত-কপোতীর মত পারস্পরিক চক্ষুর আস্বাদনে বিভোর হয়ে আছে কোন এক অনাবিল আনন্দে। বৃদ্ধেরা দলবদ্ধ হয়ে বসেছেন দাবার রাজাকে বন্দী করতে। শিশুরা স্বীয় স্বভাব-সুন্দর সারল্যে মেতে উঠেছে সবুজে ঘেরা প্রকৃতির কোলে। তাদের আনন্দ-লহরীর সাথে নানা শব্দ, সঙ্গীত আর নৃত্যের ছন্দ মিশে এক রমণীয়, উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সারা পার্কের বুকে!

কিন্তু আমার অবস্থা! সবই তো নিরানন্দময়। ব্যর্থতা ও হতাশায় ভারাক্রান্ত দিকহারা পথিকের চোখে পূর্ণিমার পূর্ণশশীও যেমন ম্লান মনে হয় তেমনই মনে হচ্ছে সব যা-কিছু।

চোখ বুজে ব'সে নাম করছি অনবরত। ফল্গুধারার মত অশ্রুধারা অবিরল ধারে বয়ে চলেছে অন্তরজগতে। কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়েছি অবসন্নতার চাপে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে। চেয়ে দেখি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘকায় যুবক! একগাল হাসি ছড়িয়ে বলল—Halloo Mr. Biswas! How are you? What are you doing here?

(হ্যালো মিঃ বিশ্বাস! তুমি কেমন আছ? এখানে কি করছ?)

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করছি—কে এই যুবক!

ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছে যে আমি তাকে চিনতে পারিনি। তাই আমার হাতখানা চেপে ধরে বলল—I am Bob!' (আমি বব্)

Bob Blooming Cranzt. মনে পড়ে গেল সব কথা! মাস চারেক আগে রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে পরিচয় হয়েছিল এই যুবকের সঙ্গে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলাপ করতে-করতে নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে! মটরের ডালে ফুলকপি, টম্যাটো, ব্রকলী, বাদাম, কিসমিস্ ও মাখন প্রভৃতি দিয়ে রান্না করে ভাত খেতে দিয়েছিলাম সাহেবকে! সাহেব খুব খুশি হয়েছিল ভারতীয় সরল খাবার ডাল-ভাত খেয়ে। বেশ কয়েকবার 'Thank you' বলে নিজের তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে বিদায় নিয়েছিল সেদিন! তারপর থেকে আর দেখা হয়নি এই সাহেবের সঙ্গে।

কাউকে একবার দেখে চিনে রাখতে না পারাটা আমার স্বভাব-সিদ্ধ দুর্বলতা! তা'ছাড়া একই রং ও আকারের সাহেব এত বেশী দেখছি যে নির্দিষ্ট কাউকে মনে রাখা কঠিন আমার পক্ষে। আমাকে মনে রাখা এদের পক্ষে সহজ। কারণ চেহারায় ভারতীয়, আকারে খাটো, আর রঙে বিষুবীয়। সহস্র গোলাপের মধ্যে একটা গাঁদা ফুলকে চেনা যেমন সহজ, তেমনই সহস্র সহস্র দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গের মাঝে আমার মত একজন "ট্রেডমার্ক" আকারের ভারতীকে চেনা ববের পক্ষে মোটেই কৃতিত্বের নয় বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

একগাল শুষ্ক হাসি হেসে বললাম—"I am all right Bob ! Thank you !" আমার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল—'No, you don't look so, what's the matter with you ?' (না, তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না, তোমার কি হয়েছে ?')

ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমার সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বললাম—শেষ পর্যন্ত টাকার জন্য ভর্তি হতে পারব না, ভারতে ফিরে যেতে হবে। পরশু দিনের মধ্যে নয়শো ডলার জমা দিতে হবে।

বব্ প্রশ্ন করল—'How much do you have ? (তোমার কত টাকা আছে ?)

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য এক গাল হেসে বললাম—99 dollars may produce one hundred (আর ৯৯ ডলার হলে ১০০ ডলার হবে।)

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল বব্। তার স্কেটের ডগা দিয়ে মাটিতে একটা ধাক্কা মেরে বলল—Don't worry. I will give you the money. (ভাবনা করো না, আমি তোমাকে টাকা দেব।)

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। সবিস্ময়ে বললাম, তুমি টাকা দেবে ? অত টাকা শোধ দেব কি করে সাহেব ?

স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল বব্, 'তোমাকে টাকা শোধ দিতে হবে না। আমি তোমার জন্য টাকা রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে মিঃ বিশ্বাস, কাল তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব ! এখন বিদায়।

ঝড়ের বেগে জনারণ্যে মিশে গেল সাহেব। আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি।

পরের দিন বেলা ন'টা। একটি ছেলে এসে ৯শ ডলার আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার সমস্ত শরীর ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল কি এক অব্যক্ত আনন্দ, বিস্ময় ও দয়ালের অপার করুণার অপ্রত্যাশিত বর্ষণে।

দয়ালের প্রতিকৃতির সামনে আভূমি প্রণিপাত জানাতেই কোথা

থেকে অজস্রধারে অশ্রুধারা বেরিয়ে এল দৃষ্টিকে ঝাপসা করে। কেঁদে বললাম— ঠাকুর তোমার করুণার অন্ত নেই! তাইতো তুমি দয়াল।

বিরাট সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় শেষ হল টিউশন ফী জমা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রি করার সঙ্গে।

এবার ভিসা পরিবর্তনের পালা। 'I-20' form ও পঁচিশ ডলার সঙ্গে হাজির হলাম ইমিগ্রেশন অফিসে। যথানির্দিষ্ট লাইনে অপেক্ষা করছি। আমার পালা এলো। পঁচিশ ডলার জমা দিয়ে ডেস্কের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি রসিদ নেব তবে তো যাব। এতগুলি টাকা—যে জমা দিলাম তার প্রমাণ থাকবে না আমার কাছে!

কৃষ্ণাঙ্গী রিসিভিং অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— 'You may come dear' (তুমি এখন যেতে পার পার মণি।)

আমি ভারতীয় ধাঁচে বলে উঠলাম, Receipt। (রশিদ)। ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকী হেসে বললেন— Don't wory,—no need—ভাবনা করো না, কোনো প্রয়োজন নেই)।

নিজেই লজ্জা পেলাম। লাইন থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্য করলাম কেউই ফী জমা দিয়ে রসিদ নিচ্ছে না।

'I-20' form ও অন্যান্য form পূরণ করে যথাস্থানে জমা দিলাম। সে ভদ্রমহিলা বললেন—"O. K. dear, you may begin your class. We shall send your visa in due time." (ঠিক আছে মানিক! তুমি ক্লাশ শুরু করগে। সময় মত তোমার ভিসা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।)

ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে চলেছি সাব-ওয়েতে উঠব বলে। মনে মনে ভাবছি, আশ্চর্য এদের বিশ্বাস! জাতীয় চরিত্রে এই মহৎ গুণ কত বছরে যে অর্জন করেছে তা কে জানে।

জুলাই মাসে নিউইয়র্ক শহরে ঘুরতে-ঘুরতে একটা Public Library-তে ঢুকে পড়েছিলাম। তাদের "মেম্বার" হতে চাই বলার পর এক তরুণী একখানা ছাপান ফর্ম দিল। তাতে আমার নাম ও নিউইয়র্কের ঠিকানা লিখে দিতেই একটা "মেম্বারশিপের" কার্ড দিল। বলল—Go inside and take as many books as you like. (ভিতরে যাও এবং যে ক-খানা খুশি বই নিয়ে এস)।

পছন্দমত সাতখানা বই নিয়ে লোন-স্লিপে (loanslip) বই ও তার লেখকের নাম লিখে তাতে সই করে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় আসতে আসতে ভাবলাম, এরা কি বোকা নাকি? আমাদের কলকাতায় ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে ভর্তি হতে গেলে দুইজন বিশিষ্ট লোকের রেকমেণ্ডেশন লাগে, সিকিউরিটী মানি জমা রাখা লাগে। এবং যে টাকা জমা থাকে তার বেশী মূল্যের বই নেওয়া যায় না। আর এরা? টাকার প্রশ্ন তো নাই-ই। তাছাড়া আমার নাম রেবতী বিশ্বাস, কি ভূপতি সিকদার, আমি 32 East 7th St. এ থাকি না 23rd 30th St.-এ থাকি তার তো কোন প্রমাণ চাইল না? আমি যদি বইগুলি ফেরত না দিয়ে গা ঢাকা দেই তাহলে আমার হদিস্ পাবার কোন পথ নেই এদের।

আমার সোসাল সিকিউরিটি নাম্বার তখনও হয়নি। প্রত্যেক লোকের ঐ নাম্বার থাকে। কোন ব্যক্তির ঐ নাম্বার জানা থাকলে "কম্পিউটার" থেকে তার অন্নপ্রাশনের সংবাদ পর্যন্ত মুহূর্তে জেনে নিতে পারে এরা। অবশ্য পরবর্তীকালে social security number নেবার সময় যে ফর্ম পূরণ করেছিলাম তাতে যে বিবরণ দিয়েছিলাম তা সত্য কি না তাতো কোন বিশেষ ব্যক্তি সার্টিফাই করেনি! মানুষের প্রতি এই সহজ বিশ্বাস এদের অফিসিয়াল কাজকর্মকে কত সহজ করে তুলেছে।

হাউজারম্যানদা ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে। তার সঙ্গে এসেছে ডেনীশ গুরুভাই স্টীভ। আরও অনেক লোক যোগদান করেছে আমাদের 'সৎসঙ্গ' পরিবারের সঙ্গে। এদিকে নীল ও লী সেলডন্ ষ্টেটে ফিরে আসছে শীঘ্রই। তাই স্থির হল

32 No. 7th St.-এর বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা প্রশস্ত বাসা ভাড়া নেওয়া হবে।

6th Avenue-তে ১৮নং ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর দোতালায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হল। একটু মান-সম্মান বা দু-চারটে বেশী পয়সা যাদের আছে তারা এই রকম ঘরে বাস করে না। একে ঠিক 'অ্যাপার্টমেন্ট' বলে না। এর পরিচিত নাম "স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট" ব স্টুডিও। সাধারণতঃ দোকানপাট করার উদ্দেশ্যেই ভাড়া নেয় এ ধরণের ফ্ল্যাট।

একখানা ত্রিভুজাকৃতি ঘর। এককোণে রান্নার বিরাট গ্যাস-স্টোভ ও ফ্রীজ। আর এককোণে ছোট্ট একটু আবডালের মধ্যে পায়খানা, তার পাশে বাথ-টব বা স্নানের হাওদা। ঘরের চার দেয়াল ও মেঝের অবস্থা দেখলে দর্জিপাড়ার শ্রীকান্তবাবু নিশ্চয়ই লজ্জা পেতেন।

পরিবারের স্থায়ী সভ্যসংখ্যা হয়েছে সাতজন। নিত্য গড়ে আরও পাঁচজন থাকেই। জানী নামক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠায় বহু যুবক-যুবতী আনাগোনা করে এখানে। দীক্ষাও নিয়েছে তাদের অনেকে। জানীর খোদ কর্তা নিক ভিসিলী ও তার গৃহিণী ন্যান্ ভিসিলীও দীক্ষা নিয়েছে।

প্রতিদিন দশ থেকে বার জন লোকের রান্না-বাড়া আমাকেই করতে হচ্ছে। শুধু কি রান্না? তার আনুষঙ্গিক কাজও। সব চাইতে কষ্টের হয়েছে বাজার করা। পূর্বের অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই ছিল বাজার। শ্রীমান হরিনারায়ণ সঙ্গে যেত। অধিক ভারি বোঝা সে-ই টেনে আনত। ভাগে-যোগে বহন করায় অত কষ্ট হতো না। কিন্তু সে এখন ওয়ার্ক ট্রেনিং-এ আছে। অর্থাৎ চাকুরি করে। ডেগলাল ভাইও খুব সকালে বেরিয়ে যায়! আসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে। তাই প্রায়ই একাই যেতে হয় বাজারে। তাছাড়া পূর্বের চাইতে ভারতীয় সামগ্রীর দোকান ও বাজারের দূরত্বও বেড়ে গেছে অনেক।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। তাপমাত্রা ফ্রীজিং পয়েন্টের অনেক নীচে। কখনও বা—২০° ফাঃ হতে কসুর করে না। ঝিরি-ঝিরি বরফ পড়ে সারা শহরে। তার সাথে 'ওয়েষ্ট উইণ্ড' (পশ্চিমী বাতাস) যে জ্বালার সৃষ্টি করে তাতে শরীরের অনাবৃত অংশ নাক ও কপাল জ্বলে যায়। মনে হয় এক্ষুণি দেহচ্যুত হয়ে ঝরে পড়বে ও দুটি। এর ওপরে দুই হাতে দুইটি ভারি ব্যাগ বহন ক'রে আনতে প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চায়! বরফে আবৃত পিচ্ছিল পথে পা টিপে-টিপে চলতে পা দুটোও অবশ হয়ে আসে। মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি রাস্তায়। জনমানবশূন্য রাস্তা। শুধু গাড়ীর চাকার চাপ থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বরফগলা জলের তীব্র আলিঙ্গন ও চুম্বন ছাড়া আর কোনই সাহায্য জোটে না কারও কাছ থেকে। অস্ফুট কণ্ঠে চাপা কান্না বেরিয়ে আসে: দয়াল, আর কতকাল বইতে হবে এই বোঝা! আর যে পারি না ঠাকুর!

বহু কষ্টে স্টুডিওতে পৌঁছানর পর নানা বাবুর নানা কৈফিয়ৎ— তাদের পছন্দ মত জিনিস আনা হয়নি কেন? বৃটিশ রাজত্বকালে ইংরাজ-সাহেবের পিঠ চাপড়ানীতে পুষ্ট কোন কোন বাঙালী যেমন স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর ওপরে লাঠি চার্জ করে প্রভুভক্তির পরিচয় দিত ঠিক তেমনই আমেরিকান সাহেবের অনুকম্পাপুষ্ট কোন-কোন ভারতীয় এই দীন পাচক-কাম্-মজুরের ওপরে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত; এমন কি একদিন একজন অনাহূত যেভাবে "মেরে সোজা করে দেব" ব'লে ধেয়ে এল তাতে মনে হল পৃথিবীর দ্বাদশ আশ্চর্য প্রত্যক্ষ করছি। আহো অদৃষ্টম্! ভারতে যে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পাবেনা, সে কি না আজ তেড়ে মারতে আসে! আর আমেরিকান পৃষ্ঠপোষক তাকে বুক দিয়ে আটকিয়ে যীশুর ভাষায় বলে ওঠেন: "Don't mind, forget" (কিছু মনে করো না, ভুলে যাও।)

ভুলে না যেয়ে উপায় কি? উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কত লাঞ্ছনা, অপমান আঘাত মানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার তো সে তুলনায়

তেমন কিছুই ঘটেনি! এখান থেকে চলে যাবার কোন পথও নেই; কারণ, আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে বা হোটেলে থাকতে গেলে প্রচুর ডলারের প্রয়োজন। পাব কোথায়? তাছাড়া, ইষ্টের পতাকাবাহী বলে পরিচয় দিয়ে পরস্পর কলহ ক'রে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় যে মিলন কেন্দ্র, "সৎসঙ্গ" আমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার উপরে কি প্রতিক্রিয়া হবে? তাই নিঃশব্দে সহ্য করেছি সব!

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সাল। আজ প্রথম ক্লাস শুরু। মনে খুব আনন্দ আবার নূতন ক'রে ছাত্রজীবন! পাশ্চাত্যের কত মনীষী কত নাম করা অধ্যাপকের কাছে পড়ব! কত নূতন জিনিসই না শিখব! ডঃ লা. এ. বেলফোর্ড, ডঃ ফীসার ও ডঃ ডড্সনের কাছে সপ্তাহে চারটা ক্লাস করতে হবে!

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে "সিমেষ্টার" ও "ক্রেডিট্" পদ্ধতি। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত "স্প্রীং" সিমেষ্টার। জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত "সামার" ও সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত "ফল্" সিমেষ্টার বলে। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে বছরের যে-কোন একটি বা সবকটি সিমেষ্টারেই পড়তে পারে। প্রতিবারেই নূতন করে ভর্তি বা রেজিষ্টার্ড হতে হয়।

সফোমোর (I. A.); ডিগ্রী (B. A.), গ্র্যাজুয়েট (M. A.) ও ডক্টরেট্ (Ph. D.)—এই প্রতিটি কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট ক্রেডিট পেতে হয়। সাধারণতঃ একটি বিষয়ে পাশ করলে তিন ক্রিডিট, কোন কোন বিশেষ বিষয়ে চার ক্রেডিট দেওয়া হয়। কোর্সের জন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে এক বছরেই সবগুলি ক্রেডিট লাভ করতে পারে। আবার অসুবিধা হলে পাঁচ বৎসর ধরেও একটা কোর্স-এর জন্য নির্দিষ্ট ক্রেডিট সংগ্রহ করতে পারে। এটা নির্ভর করছে কোন্ ছাত্র প্রতিবৎসর ক'টা সিমেষ্টার পড়ছে ও প্রতি সিমেষ্টারে ক'টা বিষয় বা ক্রেডিট (বিষয় × ৩) নিয়ে পাশ করছে। যে সময়েই হোক, সবগুলি ক্রেডিট লাভ হলে ছাত্রকে

আমন্ত্রণ ক'রে ডিগ্রী দেওয়া হয়। আমার পি. এইচ্. ডি. কোর্সের জন্য মোট ৪২টি ক্রেডিট নিতে হবে। তার মধ্যে পড়ে পাশ ক'রে নিতে হবে ৩০টা ক্রেডিট আর থিসিসের জন্য পাওয়া যাবে ১২ ক্রেডিট। আমি সিমেষ্টারে ১২টা ক্রেডিট নিয়েছি।

একসঙ্গে সবগুলি পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষা দেবার বাধ্যতামূলক চাপ না থাকায় ও ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের খুশিমত বিষয় পাঠ্য হিসাবে নিয়ে হেসে-খেলে পরীক্ষা দিতে পারে ব'লে পরীক্ষাটা ভীতিপ্রদ নয় এদের কাছে। পাশ করার আঁকুপাকু না থাকায় নকল করা বা নকল পাকড়াও করার কোন সমস্যাই নেই এদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

পরীক্ষা পদ্ধতিও বড় সুখপ্রদ। একটা বিষয়ে একজন অধ্যাপকের কাছে পড়ে বিশ-বাইশ জন ছাত্র-ছাত্রী। যিনি পড়ান, তিনিই প্রশ্ন করেন, তিনিই ক্লাসে বলে দেন কবে পরীক্ষা নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে টাইপ করা প্রশ্নপত্র খাতার ভেতরে গুঁজে দিয়ে দেন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে। দুই ঘণ্টা ধরে পরীক্ষার শেষে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র ঐ অধ্যাপকের হাতে জমা দিয়ে বেরিয়ে যায় সকলে। ঐ অধ্যাপকই খাতা পরীক্ষা করেন ও প্রত্যেকের 'গ্রেড' যথা A, B, C, D, ইত্যাদি যা তারা পায় তা রেকর্ডিং অফিসে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যেকটি বিষয়েই একই নিয়ম। কোন ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা দিতে না পারলে তাকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না বা পরবর্তী পরীক্ষায় সববিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় না। আমাদের দেশের মত কম্পার্টমেন্টাল বলে কিছু নেই এদেশে। অধ্যাপককে জানালে তিনি সেই বিষয়ে পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেন অথবা প্রশ্নপত্র দিয়ে বলেন, "বাড়ী থেকে লিখে এনো"। ঐ রকম পরীক্ষাকে **"Take home Exam."** বলে।

সবচাইতে আশ্চর্য মনে হয়েছে এদের পড়ানোর পদ্ধতি দেখে। একই অধ্যাপকের কাছে একই বিষয়ে একসঙ্গে ক্লাস করছে—বিভিন্ন মান ও কোর্সের ছাত্রছাত্রী।

ডঃ বেলফোর্ড ক্লাস নিতেন "ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন"-এর। যারা আমরা পড়তাম তাদের মধ্যে ছিল—১৬ বছরের আই-এ. ছাত্রী, ১৮-২০ বছরের বি-এ. ছাত্র বা ছাত্রী, ২১ বছর থেকে ৩১ বছরের এম. এ. কোর্সের ছাত্র বা ছাত্রী, আবার আমার মত ৪০-৪২ বছরের ডক্টোরাল কোর্সের ছাত্র বা ছাত্রী। আমরা সকলে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছি—একসঙ্গে বসে। কিভাবে যে পরীক্ষক আমাদের উত্তরপত্র বিচার করে 'গ্রেডের' সাহায্যে মান নিরূপণ করলেন তা আজও রহস্যময় আমার কাছে। এটা কতকটা একজন গৃহশিক্ষকের কাছে পাঁচ ভাই-বোনে পড়ার মত।

সকাল ৭টা থেকে রাত্র ৯টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকে। যে ছাত্রের যখন যে-বিষয় পড়ার সুবিধা সে সেই বিষয় নিয়ে পড়ে। আমার ক্লাস ছিল বিকাল ৪-৩০ মিনিট থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত। বেশীর ভাগ ছাত্রীই চাকরি ক'রে পড়াশুনা করে। তাই অনেকেই ক্লাসে আসত—হাতে স্যাণ্ডউইচ্, স্যালাড, আইসক্রীম বা অন্য কোন খাবারের পাত্র নিয়ে। অধ্যাপক পড়াচ্ছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা খাবার খেতে খেতে তা শুনছে। মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ক্লাসের মধ্যে একটা পেয়ারাতে কামড় দিয়েছিলাম ব'লে গোটা পিরিওডটা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল নিজের কান ধ'রে।

অধ্যাপক অপেক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরাই বক্-বক্ করে বেশী। অধ্যাপক একটা প্রশ্ন তুলে ধরেন। ছাত্র-ছাত্রীরা একের পর এক তাদের মতামত ব্যক্ত করে। মাঝে-মাঝে বিরক্ত লাগতো—শেষ পর্যন্ত এদের ছাইপাঁস শুনবার জন্য ক্লাসে আসতে হবে? কিন্তু উপায় কী?

কোন ছাত্র বা ছাত্রী ভুল মন্তব্য করলে অধ্যাপক "তুমি ভুল করেছ" বলে সচেতন ক'রে দিতেন না। একদিন একটি ষোল বছরের ছাত্রী জোর-গলায় ব'লে উঠল—**I don't agree with you Belford.** (বেলফোর্ড, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।) আশ্চর্য যে ডঃ বেলফোর্ড তাকে তার ভুলটা ভুল ব'লে ধরিয়ে দিলেন না। তিনি সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর (**authority**)

মত তুলে ধরলেন ও শেষে আবার নিজের কথাটা তুলে ধরলেন। ছাত্র নিজেই বুঝে নিল কোন্‌টা প্রকৃত উত্তর।

একদিন হাসি পেল—ক্লাসরুমে বিরাট দীর্ঘকায় ব্লাকবোর্ডের উপরে "No Smoking" নোটিশ দেখে। ভাবলাম শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সুসভ্য ব'লে খ্যাত জাতিকেও নোটিশ দিতে হয়। সেদিন তো রুমাল চাপা মুখে বেশ খানিক না হেসেই পারলাম না। হঠাৎ দেখি অধ্যাপক নিজেই ডায়াসে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছেন। তাঁরই মাথার ওপরে রয়েছে "No smoking' বোর্ড। ছাত্র-ছাত্রীরাও সিগারেট খায় ক্লাসের মধ্যে বসেই। ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীরাই নাকি বেশী ধূমপান ক'রে আজকাল।

শত কষ্টের মধ্যেও পাঠ্যজীবনের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ আনন্দেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। কত দেশ-বিদেশের ছাত্রের সঙ্গে পরিচয়! কত ছাত্রীদের দেশীয় কায়দায় শিষ্টাচার বিনিময়ের সাথে প্রত্যক্ষ প্রশ্ন: **Are you married? Do you have girl-friend?** ইত্যাদি? (তুমি কি বিবাহিত। তোমার কি মেয়ে-বান্ধবী আছে?) শুধু প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হ'লে তো হোতোই! প্রত্যক্ষ প্রশ্নের সঙ্গে পরোক্ষ প্রস্তাব কি কম! সেই প্রস্তাবে রাজী হ'লে 'অসহযোগ আন্দোলন' নূতন করে শুরু হ'য়ে যেত সুদূর দেওঘরে আমার শান্ত গৃহ-কোণে। স্বয়ং ভারত-সম্রাজ্ঞী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মঞ্জুর করলেও আমার গৃহিণী সে আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত চিঠি এল সরকারের ইমি-গ্রেশন বিভাগ থেকে। যা-লিখেছে তার সংক্ষিপ্ত সার হল এই: "আমি ভারতবর্ষে থেকে কোন ছাত্র হবার দরখাস্ত করিনি? ট্যুরিষ্ট হিসাবে এসে ছাত্র হবার জন্য আবেদন করে আমি ইউনাইটেড ষ্টেটের আইনকে অমান্য করেছি। তাছাড়া আমার গৃহে স্ত্রী, চার কন্যা ও এক পুত্র পোষ্য আছে। দীর্ঘ তিন বৎসর এদেশে থাকলে তাদের ভরণ-পোষণ করবে কে? অতএব তোমাকে স্টুডেন্ট-ভিসা মঞ্জুর করা হলো না। অতি শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে হবে।"

কালবৈশাখীর ঘন কুজ্ঝটিকা যেমন গ্রাস ক'রে ফেলে সারা প্রকৃতিকে ; চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে যায় এক মুহূর্তে—ঠিক তেমনিই অবস্থা হল আমার। চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল আমার কাছে। সর্বনাশ! এতদূর অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত খোদ্ সরকারী ডাণ্ডা! ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম ভাবতে ভাবতেঃ "যত কিছু আজি আয়োজনরাজী সব হবে মিছে?" পাঁচ পাউণ্ড ওজন কমে গেল একদিন রাত্রের মধ্যে। যে দেখে সেই বলে ছয় মাসের রোগী।

হাউজারম্যানদা উৎসাহ দিয়ে বললেন, **Don't worry. Let us see what Thakur does!** (ভেবো না, দেখা যাক্ ঠাকুর কি করেন!)

পরের দিন শুক্রবার। স্পেন্সারদা ও অঁদ্রেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলাম জন ব্যারী নামে একজন উকিলের কাছে। ইন-কাম-ট্যাক্সের এই উকিলের মত মিঃ ব্যারী হচ্ছেন ইমিগ্রেশনের উকিল। এই ভিসা-সমস্যার কাজ করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন তিনি। আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব রেখে দিলেন আমার কাছ থেকে। আমি তো দয়াল ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে ফিরে এলাম অ্যাপার্টমেন্টে।

সোমবারের দিন জানালেন মিঃ ব্যারীঃ ডি. ডি. মোশন মুভ্ ক'রে আমার স্টুডেন্ট ভিসা মঞ্জুর করিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কাজের জন্য এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেননি আমার কাছ থেকে। কালবৈশাখীর কালো মেঘ যে এত সহজে উড়ে যাবে তা ভাবতেও পারিনি। অফুরন্ত তাঁর করুণা।

প্রথম সিমেষ্টার শেষ হয়ে গেল। প্রত্যেকটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড 'এ' পেয়েছি। ডঃ বেলফোর্ড আমায় তাঁর চেম্বারে ডেকে নিয়ে বললেন, **I wonder Mr. Biswas, you have such a vast study.** (আমি বিস্মিত যে তোমার এত গভীর পড়াশুনা করা আছে)?

আমি হাত জোড় করে বললাম—Sir, this is all my Master's mercy (স্যার এ সবই আমার প্রভুর করুণা)। কারণ, আমি যা লিখেছি সবই তাঁর চরণপ্রান্তে ব'সে শোনা। সশ্রদ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন ডঃ বেলফোর্ড—A strange devotee (এক অদ্ভুত ভক্ত !)

সামার সিমেষ্টারও পড়ব ঠিক করলাম। সামারে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই চাকরি ক'রে টাকা জমায়। আমিও ফুল টাইম চাকরি করার অনুমতি ও চাকরি পেলাম। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে একটা কাজ। সপ্তাহে ৯০ ডলার মাহিনা। কিন্তু ফুলটাইম চাকরি করলে পড়া যাবে না সামারে। পূর্বের সেই যুবকটি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলল—"Don't miss the summer Semester. Remember, you are for Thakur. I shall help you." (সামার সিমেষ্টার বাদ দিও না। মনে রেখো তুমি ঠাকুরের। আমি তোমাকে সাহায্য করব।)

তাই হল। সামার সিমেষ্টারে ৬টা ক্রিডিট ক্রেডিটের সঙ্গে লাভ করলাম।

ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার তারিখ এগিয়ে এল। যে যে-বিষয়ে গবেষণা করবে তার সেই বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা নিরূপণের জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা। ছয় ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করলে ৬০০ ডলার ফী দিয়ে ডিসার্টেষণ প্রোপোজাল সেমিনার নামে দুইটি কোর্সে পড়তে হবে। তাতে পাস করলে তিনজন অধ্যাপকের অধীনে থেকে থিসিসের রূপরেখা (out line) লিখতে হবে। সেই আউট লাইন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করলে তার ভিত্তিতে থিসিস্ লিখতে পারবে ছাত্র।

কিন্তু আমি এখন ম্যাট্রিকুলেটেড হই নাই। 'এসে' (কম্প্রীহেন-সিভ টেষ্ট) পরীক্ষায় পাশ করেছি। কিন্তু জি. আর ই. পরীক্ষায় ডাঃ থমসনের কথাই সত্য হয়েছে। অঙ্ক ও ইংরাজীর প্রশ্নপত্র হাইস্কুলের অষ্টম বা নবম শ্রেণীর মানের। কিন্তু প্রশ্নের সংখ্যা এত

বেশী যে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নগুলি পড়ে যথার্থ উত্তরটিতে দাগ দিয়েও পারা যায় না—বিশেষ ক'রে বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে খুবই কঠিন। এক হাজার পেলে পাস। আমি পেলাম ৯২০. নম্বর। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটি এক্সামিনারস্ কমিটির সম্মুখে ইণ্টারভিউ দিতে হাজির হলাম নির্দিষ্ট দিনে। বিন্দুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ নেই আমার। কারণ দর্শন, ধর্ম বা শিক্ষা সম্বন্ধে যে-কোন প্রশ্নই করুক না কেন, তার জবাব যে দিতে পারব সে বিশ্বাস আমার কাছে।

পাঁচজন সভ্যের সাব-কমিটি। ডঃ হাগ নামে একজন মহিলা এই কমিটির চেয়ারম্যান। ডঃ বেলফোর্ড আমার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত।

ডঃ হাগ প্রথমে আরম্ভ করলেন: **Why do you want to do Ph. D. here?** (তুমি এখানে পি. এইচ. ডি. করতে চাও কে'ন?)

আমি ইংরাজীতে যা উত্তর দিলাম তার বাংলা মর্মার্থ হল: আমার গুরুদেবের ইচ্ছা যে আমি পি. এইচ্ ডি. করি।

ডঃ হাগ—**Who is yonr spiritual master? Tell us something about him.** (কে তোমার গুরু? তাঁর সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু বল!)

আমি সংক্ষেপে পাঁচমিনিট মত সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বললাম।

ডঃ হাগ:—**Well, it is Thakur's desire! What is your desire** (ভাল কথা, এটা তো ঠাকুরের ইচ্ছা! তোমার ইচ্ছাটা কী?)

আমি উত্তর দিলাম—ঠাকুরের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমার জীবনের লক্ষ্যই ইচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছাকে পূর্ণ ক'রে তোলা।

অন্য একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন—তোমার ঠাকুর তো জীবিত নেই! এখন কে তোমার গুরু? ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার পর তুমি কী করবে?

আমি—**Thakur's eldest son Rev. Borda is there.**

He is my living guide, I will do what he will ask me to do. (ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমপূজ্যপাদ বড়দা আছেন। তিনিই আমার জীবন্ত পরিচালক! ডিগ্রী পাবার পর তিনি যা করতে বলবেন তাই করব।)

অপর একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন—What do you understand by truth? (তুমি সত্য বলতে কী বোঝ?)

আমি—সত্য তাই যা সত্তাকে ধারণ করে ও বিবর্ধনের দিকে নিয়ে যায়।

ডঃ হাগ উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন—O K. you may go now. We shall inform you of our decision. (ঠিক আছে, তুমি যাও। বোর্ডের সিদ্ধান্তের কথা তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।)

"থ্যাঙ্ক ইউ" ব'লে বেরিয়ে এলাম হল থেকে। নির্বাচন সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা ছিল না আমার মনে। বিরাট ফাঁড়া কেটে গেল মনে করে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুতপদে ফিরে এলাম অ্যাপার্টমেণ্টে। মনে খুব স্ফূর্তি! দুইটি বিরাট ভুট্টা সিদ্ধ করলাম ষ্টোভে। তাতে মাখন, লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া মাখিয়ে মনের আনন্দে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পার্কে ঘুরতে।

পরদিন রাস্তায় ডঃ বেলফোর্ডের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই তাঁর চোখদুটি ছলছল করে উঠল। ধরাগলায় বললেন—মিঃ বিশ্বাস আমি প্রকৃতই তোমার জন্য দুঃখিত। তোমার উত্তরগুলি তৎপর ও পরিষ্কার ছিল। আমি বুঝতে পারছি না তবুও তারা কেন তোমাকে ফেল করাল। আমার তো ভোট দেবার অধিকার ছিল না। তাই তাদের সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বেরিয়ে এসেছি। তবে একটা স্লিপ রেখে এসেছিলাম—মিঃ বিশ্বাস আমার সমস্ত ক্লাসের মধ্যে সর্বোত্তম ছাত্র। **Mr. Biswas I am really sorry for you. I don't understand how did they put you down! Your answers were so explicit and prompt! I did not**

have the voting right. So I had to come out before they took their decision. But I left a slip with a note, "Mr. Biswas is the best boy in all my Classes".

সংবাদটি শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল মুহূর্তে। মনে হল এখনই পড়ে যাব রাস্তায়। বললাম, What does it mean sir? (এর মানে কি স্যার?)

ডঃ বেলফোর্ড—ডক্টোরাল কমিটি তোমাকে নির্বাচন করেনি মানে নিউইয়র্ক-বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার পড়া শেষ। তোমাকে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

কাতরভাবে বললাম—তাহলে এখন উপায়?

তাঁর চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন ডঃ বেলফোর্ড—**I am undone Mr. Biswas. You better try to find out the reason behind it.** (আমি নিরুপায় মিঃ বিশ্বাস। তুমি বরং চেষ্টা করে দেখ জানতে পার কিনা তোমাকে ফেল করানোর পেছনে কারণ কী!)

রাস্তা দিয়ে চলতে পারছি না। বুকের ভেতরটা যেন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। অজ্ঞাতে ঝর্ণাধারার মত অশ্রুধারা বেরিয়ে চোখ-দুটোকে ঝাপসা ক'রে তুলছে বারে বারে। এত পরিশ্রম ক'রে এত টাকা খরচ ক'রে সমস্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ 'গ্রেড' পেয়ে শেষপর্যন্ত ফেল কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ভারতে ফিরে যেতে হবে আমাকে। আর ভাবতে পারলাম না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম রাস্তার ওপরে। একজন পথচারী আমায় উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। পায়ে চোট লাগল বেশ।

কেউ নেই সান্ত্বনা দেবার। শূন্যঘরে শুয়ে পড়ে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদি আর অগতির গতি ঠাকুরকে ডাকি। অবশ দেহে New School, Fordam, Stoney Brook প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন

ক'রে ভর্তি হবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে ফিরে এলাম। সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে কি ভয়ঙ্কর রাস্তা পার হয়ে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেই যে চেষ্টা করেছি তা মনে হলে এখনও শরীর শিউরে ওঠে।

আনন্দ গোপনে ও বিশ্বস্তসূত্রে খবর সংগ্রহ করল।

জানতে পারলাম কমিটি তাদের মিনিট বুকে মন্তব্য করছেন : মিঃ বিশ্বাস তার গুরুর উপরে এত নির্ভরশীল যে তার কোন নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাশক্তি যা গবেষণা কার্যে নিতান্ত অপরিহার্য তা' থাকতে পারে না। সুতরাং তাকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। **Mr. Biswas is too much dependent on his spiritual Master. He cannot have the faculty of independent thinking an essential ingredient to doctoral study. So he should not be allowed to proceed further.**

নিজের পিতার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে ভাবতে পারে না এরা। এদের **sense of individualism** (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ) এত প্রখর! তাই 'গুরুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা', 'পূজ্যপাদ বড়দা যা বলবেন তাই করব' এইজাতীয় মনোভাব হজম করতে পারেনি।

ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পরমদয়াল ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে আকুল হয়ে কাঁদছি। এত কান্না জীবনে আর কোনদিন কেঁদেছি ব'লে মনে পড়ে না! কতক্ষণ কেঁদেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ যা অনুভব করলাম তা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। তবে ঠাকুরের নির্ব্বাক প্রতিকৃতি যে জীবন্ত মানুষের মত বাঙ্ময় হয়ে উঠলেন তা জড়-বিজ্ঞানবাদী ধী-ধুরন্দর মানুষকে বোঝানোর প্রয়াস বাতুলতা ব'লেই আখ্যাত হবে। মনে হল, ঠাকুর যেন বলছেন—'আপীল কর, আপীল (appeal) কর।' আপীলের মূল কথা কয়টি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ লিখলাম কথাগুলি—[কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট-এর মত মানুষকে ভালবাসা ও অনুসরণ করা মানে যদি তাঁর ওপরে নির্ভর করা বোঝায়, তাহলে আমার

মনে হয় এইরূপ নির্ভরতা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ক্রাইষ্ট স্বয়ং দাবী করেছিলেন। এই হচ্ছে একমাত্র উপায়—যার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে ও সাম্য-ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। আমি পুনরায় ইন্টাভিউ-এর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। If to love and follow a Man like Krishna, Buddha, Christ means to be dependent on him. I think his kind of dependency was demanded by Chirst Himself in every human life. This is the only way that can unfurl the inner facutly of independent thinking and balanced personality. I pray for re-interview.

চিঠিখানা লিখছি আর ভাবছি, আমি নিতান্তই পাগল! The Committee on Selection and Recommendation of Doctoral candidates আমাকে ফেল করিয়েছে, সিলেকসন্ করেনি! আমি যাচ্ছি পুনরায় ইন্টারভিউ নেবার জন্য আবেদন করতে!

'চিঠিখানা সম্বোধন করলাম ঐ কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ হাগকে। আনন্দ দেখে বলল—তুমি ক্ষেপেছ? যিনি তোমাকে ফেল করিয়েছেন তিনি তোমার রি-ইন্টারভিউ-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন না-কি? তার একটা প্রেষ্টিজ আছে না? ঐ চিঠি ছিঁড়ে গার্বেজে ফেলে দেবে!

একটু চুপ করে কি যেন ভাবল আনন্দ! বলল, তুমি এই চিঠির একটি কপি ডীন পেনের কাছে নিয়ে যাও! ডঃ পেন খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেখ কি হয়!

আনন্দ ডাইরেক্টরী দেখে ডঃ পেনের (Dr. John Payne, Vice Dean New York University) রুম নাম্বার ও কোন্ বিল্ডিং-এ থাকেন তা বলে দিল।

ডীন পেনের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম।

তাঁর চেম্বারের সামনের ঘরে বিভিন্ন বয়সের মহিলা কর্মরত। ডীন পেনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী এক তরুণী আমার নাম লিখে নিয়ে বলল, **Please come on Monday next at 3 P. M.** (অনুগ্রহ ক'রে আগামী সোমবার বেলা তিনটায় এস।)

সোমবার? ওরে বাবা! সে যে আরও পাঁচ দিন বাকী। মহিলাকে বার-বার অনুরোধ করলাম: **I need to see Dr. Payne immediately. Please allow me an earlier chance** (ডঃ পেনের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে একটু আগে সুযোগ দাও)। তরুণী নারাজ। তার অফিসিয়াল কায়দায় **impossible** (অসম্ভব) ব'লে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিল।

আমি আমার সমগ্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বলে উঠলাম,—**It is a life and death question to me. I must see Dr. Payne now** (আমার জীবন-মরণ সমস্যা। তাঁর সঙ্গে আমাকে এক্ষুণি দেখা করতেই হবে।)

সচকিত হয়ে উঠল ঐ ঘরের সমস্ত মহিলা কর্মচারী। তরুণী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমেরিকার বুকে কোন সুন্দরী তরুণীর কথার ওপরে প্রভুত্বব্যঞ্জক কথা যে কেউ বলতে পারে তা বোধ হয় তার অজানা ছিল। তাই আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল জানি না। তবে সঙ্কুচিত হয়ে মাথা নিচু করল। ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে আহ্বান এল—**Mr. Biswas come in please.** (মিঃ বিশ্বাস, তুমি ভেতরে এস।)

ডীন পেন স্বয়ং বেরিয়ে এসেছেন দরজার কাছে। সব শুনেছেন তিনি।

তাঁর ঘরে গেলাম। হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন ডঃ পেন—**Have a seat. What is your problem?** (বসো। কী তোমার সমস্যা?)

আমি চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠিখানা পড়েই বললেন:—**Very nice letter.** (খুব সুন্দর

চিঠি)! জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইন্টারভিউই কমিটিতে কে কে ছিলেন। কয়েকজন নাম করতে হঠাৎ ডঃ পেন রেগে গেলেন। টেবিলের ওপরে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন—**Nasty politics.** (নোংরা রাজনীতি)। মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডঃ বেলফোর্ডের সঙ্গে কথা বললেন। ডঃ বেলফোর্ড সমস্ত বিষয়টি জানালেন। একটু উত্তেজিত হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ডঃ পেন: শোন লী! তুমি কাল সকালে ডীন হার্টলীর সঙ্গে দেখা কর—কাল বেলা তিনটায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে। যেমন করে হোক মিঃ বিশ্বাসকে পুনরায় ইন্টারভিউ-এর সুযোগ দিতেই হবে। আমি চাই তার পুনরায় ইন্টারভিউ হোক।

পরের দিন সকালে। ডঃ বেলফোর্ড অকৃতকার্য্য ছাত্রের অভিভাবকের ন্যায় আমার এ পর্যন্ত লেখা সমস্ত টার্ম পেপার, বই ও বিশেষ পেপার হাতে নিয়ে পরীক্ষকের অনুকম্পাপ্রার্থীর ন্যায় এসে দাঁড়ালেন ডীন হার্টলীর দরজায়। ডীন হার্টলী হচ্ছেন যতগুলি সাবকমিটি (সিলেকশন. ফর ডক্টোরল স্টুডেন্ট্) আছে তার চেয়ারম্যান।

যথাসময়ে ডাক পড়ল ডঃ বেলফোর্ডের। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার অন্তরটা বেদনা-মথিত হয়ে উঠল। একজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ, বিশেষ করে ডঃ বেলফোর্ডের মত মানুষের আজ এই ভিখারীর বেশ—আমারই জন্য!

পরের দিন ডঃ বেলফোর্ডের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন: কমিটি সর্তসাপেক্ষে তোমার রি-ইন্টারভিউ নিতে রাজী হয়েছে। তুমি যে বিষয় থিসিস্ লিখবে তার আউট-লাইন জমা দিতে হবে। আউট-লাইন জমা দিলে আবার ইন্টারভিউ দিতে পারবে। কমিটির সিদ্ধান্তটাই বে-আইনী। পূর্বে উল্লেখ করেছি একজন ছাত্রের থিসিসে্র আউট-লাইন লেখার অধিকার কখন জন্মায়। ডঃ বেলফোর্ড যা বললেন তাতে বুঝলাম যে কমিটিও নিরুপায়। তারা আমাকে ফেল করিয়েছে। তাদের সিদ্ধান্তকে

পরিবর্তন করা তাদের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। অথচ তারা এটাও বুঝতে পেরেছে যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিভাগের ওপর-ওয়ালা থেকে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে সর্তসাপেক্ষে ইন্টারভিউ নিতে রাজী হয়েছে। তাদের ধারণা যে আমি আউটলাইন লিখতেও পারব না, অতএব ইন্টারভিউও নিতে হবে না। এ ইচ্ছে 'সাপ ও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না' নীতি।

আমি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বললাম স্যার, থিসিস্ কি বিষয়ে লিখব তা এখনও ভাবি নাই। কোর্স অর্ধেক বাকী, তাছাড়া আউটলাইন কিভাবে লিখতে হয় তা যে কোর্সে শেখান হয় তা তো পড়াই হয়নি। কেমন করে আউটলাইন লিখব তা তো বুঝতে পারছি না।

ডঃ বেলফোর্ড মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে বললেন: **Mr. Biswas! why don't you write on your Thakur? Take a concept of your spiritual Master and evaluate it.** (মিঃ বিশ্বাস! তুমি তোমার ঠাকুরের উপরে থিসিস্ লেখা না কেন? তোমার গুরুর কোন মতবাদ নিয়ে তাকে বিশ্লেষণ কর)

এ যেন নূতন কথা শুনলাম। ঠাকুরের মতবাদের ওপরে থিসিস্ লেখার কথা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই। আনন্দের তড়িৎ ঝলকে সম্মুখের গাঢ় সমস্যার অন্ধকার যেন মুহূর্তে দূরীভূত হল। বললাম: **That's novel idea.** (এটা খুব ভাল কথা!)

ডঃ বেলফোর্ডের পরামর্শমত ১২ খানা অনুমোদিত আউটলাইন নিয়ে গেলাম তাঁর চেম্বার থেকে। লাইব্রেরীতে যেয়ে বিগত বিশ বছরের থিসিসের টাইটেল (title) দেখতে দেখতে চোখে পড়ল একটা টাইটেল: **Revelation, the source of knowledge as conceived by Ellen G. White.**

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় খেলে গেল আমার থিসিসের টাইটেল! **Dharma, the upholder of existence as conceived by Sri Sri Thakur Anukul Chandra.**

পনের দিনের মধ্যে আউটলাইন লিখে শেষ করলাম। জমা দিলাম যথাস্থানে। পুনরায় ইন্টারভিউ দেবার আমন্ত্রণ এল যথা-সময়ে। এবারের কমিটিতে বার জন সভ্য। সভাপতি অন্য লোক। তবে সেই বৃদ্ধা মহিলা ডঃ হাগ একজন সভ্যা আছেন এই কমিটিতে।

এবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেন না কেউ। থিসিসের টেক্‌নিক্, শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁর ওয়ার্কস্, গবেষণার উৎস (শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্যের ২২ হাজার পৃষ্ঠা), ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। অবশ্য ডঃ হাগ এবারেও একটা প্যাচ কষতে ভুললেন না। সে প্যাচে ধরা পড়লে পাঁজরের হাড়গুলি ওখানেই খুলে রাখতে হত আমাকে। ইন্টারভিউতে পাশ ক'রে থিসিস লেখার পথেআর এক পাও এগোতে হতো না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ইন্টারভিউ শেষে অপেক্ষা করছি ডঃ বেল-ফোর্ডের চেম্বারে এসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রবেশ করলেন ডঃ বেলফোর্ড। আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন: Congra-tulation Mr. Biswas. You have been selected. (অভিনন্দন মিঃ বিশ্বাস, তুমি নির্বাচিত হয়েছ)।

হাতজোড় করে বললাম: স্যার! আপনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আশীর্বাদ! ডঃ বেলফোর্ড বললেন—আমি জানি না আমার আশীর্বাদে পাশ করলে কিনা। তবে তুমি নির্বাচিত না হলে আমরা এক মহান ছাত্রের অবদান থেকে বঞ্চিত হতাম।

বিকালে ফোর্থ অ্যাভিনিউ পার হচ্ছি পায়ে হেঁটে। এমন সময় সুমিষ্ট সম্ভাষণে মিস্ ড্যানী ব'লে উঠল—কনগ্র্যাচিউলেশন মিঃ বিশ্বাস, ইউ হ্যাভ্ বিন সিলেক্টেড্।—একটু আদর দিয়ে চলে গেল পরিচিত কায়দায়।

আমার শাপে বর হয়ে গেল। ডঃ বেলফোর্ড আমায় ডেকে বল্লেন,—তোমাকে আর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে হবে না। আমি তো তোমাকে জানি। তোমার মার্ক্স আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে

দেব। শুধু এই প্রশ্নপত্রগুলি নিয়ে যাও। বাসা থেকে উত্তর লিখে এনে সোমবারে আমার অফিসে জমা দেবে।

এই পরীক্ষা [Examination] বড় কঠিন। ছাত্র যে বিষয়ের উপরে গবেষণা করবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতা যাচাই ক'রে নেয়া হয় একটানা ছয় ঘণ্টা পরীক্ষার মাধ্যমে। আমার বেলায় সেটা "টেক হোম একযাম"-এর উপর দিয়েই মাপ হয়ে গেল।

ডিসার্টেষন প্রোপোজ্যাল-সেমিনারের ক্লাসে যেতেই ডঃ হাইস-ম্যান বল্লেন—আমার ক্লাসে তোমাকে উপস্থিত থাকবার প্রয়োজন নেই। কারণ তোমার আউটলাইন তো অনুমোদিত হয়েই গেছে। তোমার তো আর শিখবার প্রয়োজন নেই কিভাবে আউটলাইন লিখতে হবে?

আমাকে আর নূতন ক'রে আউলাইন লিখতে হল না। ঐ আউটলাইনই ছয়টা ডুপলিকেট কপি ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে নাম সই করলেন—ডঃ বেলফোর্ড, ডঃ জনসন্ ও ডঃ রবার্ট পেরী। এই তিনজন অধ্যাপকের অধীনে আমাকে গবেষণা করতে হবে।

অনুমোদন দেওয়ার প্রাক্কালে ডঃ পেরী প্রশ্ন করলেন,—Mr. Biswas, nobody in the western world knows about your Thakur, and nobody has done any work on your Thakur. How can you work on him first? You better work on Aurobindo, Vivekananda, Gandhiji:

[মিঃ বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জগতের কেউ তোমার ঠাকুর সম্বন্ধে জানে না। আজ পর্যন্ত কেউই তোমার ঠাকুরের ওপরে গবেষণা করেনি। তুমি কেমন করে সর্বপ্রথমে তাঁর ওপরে গবেষণা করবে? তুমি বরং শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ অথবা গান্ধিজীর ওপরে গবেষণা কর।]

আমি বল্লাম,—ঠিকই বলেছেন আপনি! তবে শ্রীঅরবিন্দ,

স্বামী বিবেকানন্দ বা গান্ধিজীর ওপরে একজন তো প্রথম গবেষণা নিশ্চয়ই করেছিলেন ?

ডঃ পেরী :—**Of course one did first on them.** [অবশ্যই এঁদের ওপরে একজন প্রথমে গবেষণা করেছিলেন।]

আমি—**Then why not I on Thakur first ?** [তাহলে আমি সর্বপ্রথম ঠাকুরের ওপরে করতে পারব না কেন ?]

ডঃ পেরী আর আপত্তি করলেন না। তাই তিনি বল্লেন, আমার মনে হয় ঠাকুর একজন মহান শিক্ষাবিদ্। তুমি বরং তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক মতবাদের ওপরে গবেষণা করতে পারতে।

আমি—তা পারতাম। তবে ধর্ম সম্বন্ধে লেখা হয়ে গেছে বলে আর পরিবর্তন করতে চাই না।

ডঃ পেরী আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু প্রসন্নতার হাসি হেসে বল্লেন, **All right** [ঠিক আছে।]

আবার এক সাবেকী সমস্যা এসে হাজির। ফল-সীমেষ্টারের টিউশন ফী (মাহিনা) জমা দিতে হবে ৬৬৬০ টাকা ও থিসিসের ফী বাবদ জমা দিতে হবে ৬৭৫০ টাকা। এই এত টাকা পাব কোথায় ? তবে আর ঘাবড়াচ্ছি না। যিনি তাঁর অপার করুণায় এত পথ হাত ধরে নিয়ে এসেছেন সেই পরমদয়াল ঠাকুরই যে ব্যবস্থা করবেন—এ বিশ্বাস আরও পাকা হয়ে উঠেছে আমার।

সেদিন সন্ধ্যা প্রার্থনান্তে ধ্যানে বসতেই বার বার মনে হচ্ছে, ডঃ পেরীর কাছে যাই ! তাঁকে বলি আমার সমস্যার কথা !

ডঃ রবার্ট পেরী হচ্ছেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আনন্দের অ্যাপার্টমেন্টে।

সবে মাস দুই হল নিউইয়র্কে এসেছি। হঠাৎ আনন্দ ফোনে নিমন্ত্রণ জানাল—**Rebati please have lunch with me this noon. Come on !** [রেবতী আজ দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। চলে এস।]

আনন্দের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না জানি ! তবুও

বল্লাম, তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে গেলে আমার অবস্থা হবে পশুরাজ সিংহের ভোজসভায় বকরাজ সারসের মত! তুমি খাবে মাংস, ডিম, মাটন-স্যাণ্ড-উইচ্, রঙ্গীন সুগন্ধী পানীয়, ইত্যাদি! আমি তোমার সঙ্গে লাঞ্চে কি পাব বল?

আনন্দ হেসে বল্ল, তুমি এসেই দেখ না। তোমার জন্য থাকবে, নিরামিষ পাঁউরুটী, মাখন, জেলী, বিস্কুট, চকোলেট, আইসক্রীম, আপেল, কলা, আঙ্গুর, আখরোট, কিসমিস্, দুধ, চা-কফি, কোকো-কোকা—আরও কত কী। শীঘ্র চলে এস! আর দেরী করো না। এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করাব বলেই এই আয়োজন করেছি।

আমার দুপুরের স্নানাহার ও বিশ্রাম এগারটার মধ্যেই সারা হয়ে গেছে। তাই চট্ ক'রে স্যুটট পরে যথাসময়ে হাজির হলাম আনন্দের অ্যাপার্টমেণ্টে। আনন্দ আমায় স্বাগত জানিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল তারই পাশে দাঁড়ান একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনিই ডঃ রবার্ট পেরী—নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ রিলিজিয়াস এডুকেশনের প্রাক্-স্নাতক-বিভাগের অধ্যক্ষ। পরস্পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় কায়দায় শিষ্টাচার বিনিময় হল।

ডঃ পেরী ও আনন্দ বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ভুরিভোজন করলেন। আমি দু'-চারটা কিস্‌মিস্ চিবিয়ে ও কোকোকোলার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে সময় কাটিয়ে দিলাম।

ডঃ পেরী ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন। জবাবের ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শের ছোঁয়াচ দিতে ভুল করলাম না। মনে হল—আমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছেন ডঃ পেরী! যাবার সময় আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্লেন, **Mr. Biswas would you like to speak in my class?** [মিঃ বিশ্বাস তুমি কি আমার ক্লাসে তোমার বক্তব্য রাখতে চাও?]

আমার কাছে অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি

বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আমায় আমন্ত্রণ করছেন তাঁর ক্লাসে ভাষণ দেবার জন্য! এ দয়ালেরই করুণা। মুহূর্তে দয়ালের রাঙ্গা চরণ দুখানি ভেসে উঠল আমার চোখের সম্মুখে। ঐ চরণে মনে মনে প্রণতি জানিয়ে বল্লাম, That will be a great pleasure to me Dr. Perry [সেটা আমার কাছে খুবই আনন্দের হবে।]

ডঃ পেরী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন, What have you got from Sri Sri Thakur [শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে তুমি কি পেয়েছ ?]

নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলাম ডঃ পেরীর চেম্বারে। একটি ষোড়শী আমার পরিচয় পেয়েই করমর্দন করে স্বাগত জানাল। সে ডঃ পেরীর পার্সনাল সেক্রেটারী—মিস্ সোরেলা (সম্ভবত)। তবে সে যখন জানাল যে ডঃ পেরী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ ক্লাসে আসতে পারবেন না, ফিলাডেলফিয়া থেকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে তাঁর ক্লাসে পরিচয় করিয়ে দিতে, তখন একেবারেই বিগত-আনন্দ হয়ে পড়লাম।

আমেরিকার বুকে—বিশেষ করে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে এই হবে আমার প্রথম বক্তৃতা। ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে আমার। কিন্তু এখানে ? তবুও যদি অধ্যাপক স্বয়ং হাজির থাকতেন তাহলে অনেকখানি ভরসা। একটু যে দুর্বল বোধ করছিলাম তা বলতে লজ্জা ক'রে লাভ নেই। কারণ মিস্ সোরেলার কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। যখন তাকে বল্লাম : It will be better if I come on the other day when Dr. Pery will remain present. (মিস্ সোরেলা, আমার মনে হয়, অন্য একদিন যেদিন ডঃ পেরী উপস্থিত থাকবেন সেইদিন এলে ভাল হবে] !

মিস্ সোরেলা হেসে বল্ল, No problem Mr. Biswas ; Let me introduce you to Dr. Pery's class. [কোন

সমস্যা নেই মিঃ বিশ্বাস। চল তোমাকে ডঃ পেরীর ক্লাসে পরিচয় করিয়ে দেই]

কসরৎ ক'রে হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপিটা চেপে রাখলাম। ভাবলাম, আমি কি ডঃ পেরীর ভরসায় এদেশে এসেছি ? কত বড় বড় জায়গায় পরমদয়ালের মহিমার কথা বলতে হতে পারে। এই সামান্য জায়গায় ঘাবড়াচ্ছি কেন ?

নিজের পৌরুষকে একটু উসকে দিয়ে টাইটা ঠিক করতে করতে অনুসরণ করলাম মিস্ সোরেলাকে। ডঃ পেরীর ক্লাসে পরিচিত হলাম। প্রায় ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আমার প্রতি সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করল। বিষয়-বস্তুর ওপরে এক ঘণ্টা ভাষণ দিলাম। ভাষণ শেষ হলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করল। আমার ঠিকানা ও ফোন্ নাম্বার লিখে নিয়ে গেল অনেকে।

আনন্দের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম আনন্দের একটা আমেজে ভরপুর হয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ ক'রে মনে হল আমার বক্তৃতা আদৌ ভাল হয় নি। এদেশের ভাষণে নাকি কোন emotion (ভাবাবেগ) বা কথার ফুলঝুরি ব্যবহার করা চলে না। টেবল-টকের মত আস্তে আস্তে ঠিক বক্তব্য-বিষয়টুকু প্রকাশ করাই রীতি। তাছাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের বেশী বলা নাকি শ্রোতার ধৈর্য্যের সীমাকে ভেঙ্গে দেয়। আর এদেশে বক্তাগণ পঁচিশ কি ত্রিশ মিনিট ভাষণ দেবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। এবং এইটাই এদেশের সভ্যতার অঙ্গ।

আমি তো এর কোনটাই মেনে ভাষণ দেই নি। ভাবাবেগেও ব্যবহার করেছি আবার কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগও দেই নি। মন একটু খারাপ যে হল না, তা নয়। তবে ভাবলাম—দয়ালের যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। নিয়ম অজানা ছিল—তার কি করব ?

দুদিন পরে ডঃ পেরীর চিঠি পেলাম। আমার ভাষণের অজস্র প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন তিনি। পরের দিন ফোন করলেন

আমাকে। সানুনয়ে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই ডঃ পেরী বল্লেন—মিঃ বিশ্বাস আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার ভাষণ আমি শুনতে পেলাম না! আমার প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী আমায় জানিয়েছে তারা নাকি তাদের জীবনে এইরকম ভাষণ শোনেনি। তুমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের যে উপকার করেছ তার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বল, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

আমি হাত জোড় করে বল্লাম **"Thank you Dr. Perry. Your love is more valuable to me"** [ধন্যবাদ ডঃ পেরী! আপনার ভালবাসাই আমার কাছে অধিক মূল্যবান]

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন ডঃ পেরী। শেষ পর্যন্ত বল্লেন, **"Can you give me initiation? I want to be his disciple** [আমাকে কি দীক্ষা দিতে পার? আমি তাঁর শিষ্য হতে চাই।

আমি একটু বেকুবী করলাম। ভাবলাম, বয়স্ক লোক। নিজের অধ্যাপকের মত শ্রদ্ধা করি। হাউজারম্যানদা শীঘ্রই ভারত থেকে ফিরে আসবেন। তাঁকে দিয়ে দীক্ষা দেওয়ালে হয়তো বেশী ভাল হবে! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনার পর কয়েক মাস পার হয়ে গেছে, আজ ধ্যানে বসলে ঐ ডঃ পেরীর কথাই বার বার মনে হচ্ছে।

পরের দিন দেখা করলাম ডঃ পেরীর সঙ্গে। আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনি একটা ষ্টীলের আলমারী খুলে একখানা ছাপান ফর্ম আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—এই ফর্মটা পূরণ করে উপরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

আমি তো কিছুই বুঝলাম না। বুঝবার চেষ্টাও করলাম না। ফর্মখানা আনন্দকে দেখাতেই সে আমার পিঠ চাপড়িয়ে বল্ল—তুমি খুবই ভাগ্যবান হে! যিনি তোমাকে এই ফর্ম দিয়েছেন তিনিই

হচ্ছেন এই রুথবার্ট ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান। তুম্ তো কামাল্ আদমী হ্যায়!

ফোর্ডফাউণ্ডেশন নামটি অনেকের কাছে সুবিদিত। ছোট-বড় কয়েক হাজার ফাউণ্ডেশন আছে আমেরিকাতে। বিভিন্ন ফাউণ্ডেশন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কলারসিপ্ দিয়ে থাকে। এই রুথবার্ট ফাউণ্ডেশন স্কলারশিপ্ দেয় "spiritualism" বা আধ্যাত্মবাদ-এর ওপরে গবেষণাকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে।

যথাসময়ে হাজির হলাম ইণ্টারভিউ দেবার জন্য। প্রথমে ফাউণ্ডেশনের ট্রেজারার মিঃ সোলবার্গ ও পরে প্রতিষ্ঠাতা মিঃ রুথবার্টের কন্যা মিস্ রুথবার্ট নানা প্রশ্ন করলেন। মিস্ রুথবার্ট শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর জীবনদর্শনের কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বল্লেন—**Mr. Biswas ! it will be my great fortune if I can meet you and have talks with you again. Please try to call me again at your convenience.** [মিঃ বিশ্বাস, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হলে ও আলাপ হলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করব। তুমি অনুগ্রহ ক'রে তোমার সুবিধামত আমার সঙ্গে যোগাযোগ ক'র]

টিউশন্ ফীর সমস্যা মিটে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার অবশিষ্ট টিউশন্ ফী ও থিসিসের ফী বাবদ মোট ১৫০০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল আমায় স্কলারশিপ হিসাবে। রুথবার্ট ফাউণ্ডেশনের এই বদান্যতার কথা কোনদিনই ভুল হবেনা।

ইতঃমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের যাবতীয় পুস্তকাবলী পৌঁছে গেছে। হাউজারম্যানদা কষ্ট স্বীকার করে সুদূর নিউইয়র্ক পর্যন্ত বইগুলি টেনে এনেছেন—আমার বাসা থেকে। সমস্ত বই ডাকে আনতে গেল যা খরচ পড়ত তার জন্য আবার কোন ফাউণ্ডে-শনের কাছে ধন্না দিতে হত। আমার বাবা মোট ১৩ টাকা মূল্যের তিনখানা ছোট বই এয়ার-মেলে পাঠিয়েছিলেন ৩৩ টাকা খরচ করে।

ইংরাজী ১৯৭১ সালের ১৩ই নভেম্বর আউটলাইন আনুষ্ঠানিক-ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিলাম। রেজাল্ট বেরুবে দেড়-মাস পরে। তাই অপেক্ষা করতে হবে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

চাকরিটুকু করি। পয়সা যা পাই তাতে চলে যায় কোন মতে। দু-চারটা ডলার ব্যয়-সংকোচ ক'রে বাড়ীতে পাঠাতে হয় পরিবারের জন্য। না পাঠালে পরিবারের কেউ যে অভিযোগ করবে তা নয়। তবে সন্তানের পিতা হলে সন্তানের জন্য করার যে ব্যাকুলতা পিতৃ-হৃদয়ে দেখা দেয়, সেই আবেগ থেকেই দু-চার ডলার বাঁচিয়ে পাঠাতাম। ডলার পাঠানর কোন বাধানিষেধ ছিল না মার্কিন সরকারের তরফ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় টাকা পাঠাতে গেলে যে পরিশ্রম করতে হয় ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যত কাউন্টারে ঘুরপাক খেতে হয় তা যদি এদেশে করতে হত তাহলে ডলার পাঠানর নেশা কবেই বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। অবশ্য ভারত সরকারের পক্ষে কড়াকড়ি না করেও কোন উপায় নেই। কারণ বৈদেশিকমুদ্রা অযথা খরচ হয়ে গেলে জাতীয় স্বার্থের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। মার্কিন সরকার বৈদেশিক মুদ্রার বিষয় অত চিন্তা করেন কিনা তা জানিনা। হয়তো আটলান্টিক মহাসাগরের অগণিত ঢেউ-এর মত অসংখ্য ডলারের গোল্ড ভ্যালু মজুত আছে মার্কিন রাজকোষে। তাই হাজার হাজার ভারতীয় তথা অন্যান্য বৈদেশিক নাগরিক এদেশ থেকে তাদের স্বোপার্জিত ডলার যত খুশী পাঠাতে পারেন স্বদেশে। বাধা দেন না মার্কিন সরকার। ভারত সরকারও মহাখুসী এতে। কারণ ভারতীয় নাগরিক যত টাকা পাঠাবেন ভারতে অনুপাতিক বৈদেশিক ডলার সঞ্চিত হবে ভারতের তহবিলে। অবশ্য যদি সাদাপথে পাঠায়।

আমি অবশ্য কালোপথের পক্ষপাতী নই। তাছাড়া সাদাপথে পাঠান কত সহজ ও নিরাপদের। যে কোন ব্যাঙ্কে ডলার জমা দিয়ে একটা ড্রাফট (draft) নিয়ে নিলাম ভারতে অনুমোদিত কোন ব্যাঙ্কের ওপরে। ড্রাফটখানা খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম

বাড়ীতে। বাড়ীর লোক সেই ব্যঙ্কে বা তার একাউন্টে জমা দিলেই নগদ টাকা হাতে পেয়ে যাবে।

প্রতিমাসেই আমি যে 'ডিল' পাঠাতাম তাই ভারতীয় মুদ্রার 'তাল'রূপ ধারণ করে পৌঁছাত আমার পরিবারে। এক ডলারের ভারতীয় মুদ্রায় মান গড়ে প্রায় ৮ টাকা থাকত। আমার তিন দিনের (part time) আয় ৩০ ডলার পাঠালে ২৪০ টাকা পেত আমার বাড়ীর লোক। মনে মনে খুশী হতাম ভেবে যে দয়ালের প্রসাদস্বরূপ যা পায় তার সঙ্গে এই তিলরূপী তাল তাদের স্বচ্ছলতাকে আর একটু স্বচ্ছ করে রাখবে।

স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে খেয়ে-পরে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে ভাবতে প্রত্যেক পিতৃ-হৃদয়ই বুঝি উল্লসিত হয়ে ওঠে। আমারও তাই হতো। ভালবাসার টানে সন্তানের প্রতি করার এই আবেগই মাতৃ-পিতৃ-হৃদয়ের সহজাত দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই সন্তানের কোন আপদ-বিপদ হলে পিতা-মাতা টের পান কতদূর থেকে। স্বামী স্ত্রী বা অন্য কোন প্রগাঢ় ভালবাসার সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রেও এটা হয়ে থাকে।

গত জুলাই-আগষ্ট মাসে ছেলে-মেয়েদের জন্য মনটা হঠাৎ খারাপ লাগতে লাগল। স্ত্রীকে লিখলাম প্রত্যেক ছেলেমেয়ের নাম উল্লেখ করে জানাতে কে কেমন আছে। আমার স্ত্রী শুধু বড় ও মেজ মেয়ের নাম উল্লেখ করে লিখলেন—মান্নু, রূপেং ইত্যাদি ভাল আছে।

আমার মানসিক দুর্ভাবনা দূর হল না আবার আমার স্ত্রীকে লিখলাম—প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের নাম উল্লেখ করে জানাবে যে তারা কেমন আছে।

আবার উত্তর এল,—মান্নু, রূপেং ইত্যাদি ভাল আছে। মনটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল অজানা আশঙ্কায়। স্ত্রীকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখলাম—আজ বার বৎসর বিয়ে হয়েছে আজ পর্যন্ত একদিনও আমার একটি কথাকেও অবমাননা কর নি। তোমায় বার বার

লিখছি ছেলেমেয়েদের নাম উল্লেখ করে লিখতে তারা কে কেমন আছে। তুমি তা লিখছ না কেন ?

এবারে চিঠির জবাব পেলাম আমার মনের মত করে। স্ত্রী লিখেছেন—মান্থ,রূপ., চন্দনা, বন্দনা, ঋদ্ধি ভাল আছে।'

আমার মন থেকে দুশ্চিন্তার কালমেঘ কেটে গেল। তবে চিঠিখানা আদ্যপান্ত পড়ে কৌতূহল বেড়ে গেল বেশী! প্রায় প্রতিছত্রের বহু শব্দ অস্পষ্ট। জল পড়ে কালির দাগ মুছে গেছে বহু জায়গায়। তার মাঝে মাঝে লিখেছেন—"আমার অপরাধ ক্ষমা করো।" লেখা মুছে যাবার কারণ খুঁজে পেতে দেরী হল না। হয়তো চিঠিখানা লিখে টেবিলে রাখা ছিল। বৃষ্টি জলের ঝাপ্টা এসে মুছে দিয়েছে লেখাগুলিকে। তাই লেখা মুছার বিষয় মন থেকে মুছে গেল মুহূর্তে। তবে পরবর্তী আরও তিন-চার খানা পত্রে স্ত্রী যখন একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—আমার অপরাধ ক্ষমা করো। তখন আকাশ-পাতাল ভেবেও কুল-কিনারা করতে পারলাম না কী অপরাধ সে করতে পারে! তাকে লিখলাম এমন কোন অপরাধ তুমি করতে পার না যার ক্ষমা আমার কাছে পাবে না।

নিশ্চিন্ত মনে চাকরি ও পড়াশুনা করছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের বইগুলি তন্নতন্ন ক'রে পড়ছি তাঁর মতবাদকে ছবির মত পরিস্ফুট ক'রে তুলবার জন্য। আমন্ত্রণ পেলাম মিঃ ইম্‌ব্রীর কাছ থেকে। নিউ-জার্সীতে থাকেন তিনি। প্রথিতযশা লেখক। আমাদের গুরুভ্রাতাও তিনি। আগামী বড়দিনে—২৫শে ডিসেম্বর—তাঁদের পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে।

২৫শে ডিসেম্বর। পোর্ট-অথরিটি থেকে বিশালবপু বাসে করে রওনা হলাম আমরা কয়েকজন—হাউজারম্যানদা—অন্দ্রেলুই ও তার ভাবী-পত্নী "সুজন" প্রভৃতি! মিঃ ইম্‌ব্রীর বাড়ী নিউজার্সী প্রদেশের (State) রুজভেল্ট শহরে। একঘণ্টা বিশ মিনিট চলার পর আমরা পৌঁছালাম ত্রিহোল বাস স্ট্যাণ্ডে। মিঃ ইম্‌ব্রী, তাঁর ভ্যান নিয়ে উপস্থিত বাস স্ট্যাণ্ডে। তাঁর সঙ্গে এসেছে তাঁর দুই

ছেলে ও তাদের দুই গার্ল-ফ্রেণ্ড। মিঃ ইম্‌ব্রী তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভ্যানে বসেই আমাদেরকে "ওয়াইন" অফার করলেন। হাউজারম্যানদা ও আমি বাদে সকলেই প্রসাদ পেলেন একটি বড় কাঁচের জার থেকে। মিঃ ইম্‌ব্রীর প্রস্তাবানুসারে সমবেত কণ্ঠে 'জয় রাধে' গান ধরা হল। গানের কলির দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোটর ভ্যান এগিয়ে চলেছে ঝক্‌ঝকে গ্রাম্য-পথ বেয়ে। অপূর্ব সে দৃশ্য! গ্রামের ছবি যে আরও জীবন্ত ও আরও প্রাণস্পর্শী। জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গন পার হয়ে সবুজ বনানীর ফাঁকে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত মুনি-ঋষির আশ্রম তার শান্ত পবিত্রতার পূত স্পর্শে মনপ্রাণকে যেমন মুগ্ধ ক'রে তোলে, ঠিক তেমনই গগনচুম্বী অট্টালিকা ও যানবাহন-পরিপূর্ণ শহরের চোখ-ধাঁধানো রোশনাই ছেড়ে এসে সবুজে মাখা এই গ্রাম্য পরিবেশ বড়ই আনন্দদায়ক। রূপালী ছটায় ঝক্‌ঝক্ করছে সুদূর-বিস্তারী রাজপথ। তার দু-ধারে একই প্যাটার্ণে একতলা বাড়ীগুলি ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন বাড়ীতেই ছাদ নেই। আমাদের দেশের সেকেলে আটচালা কোথাও বা চারচালা ঘরের মত চাল। তবে টিন বা অ্যাসবেস্টসের চাল নয়। কাঠের ফ্রেমের ওপরে সিনথেটিক—অর্থাৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত কাপড় জাতীয় জিনিষের ছাউনী। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ও পেছনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। অবশ্য সবুজের ভাবটা ম্লান দেখাচ্ছে বরফের দৌরাত্ম্যে। আর কদিন পরে তো একবারেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকবে বরফের নিচে। বাড়ীর কম্পাউণ্ডে কোথাও বা দুইখানা কোথাও বা ততোধিক মোটরকার গৃহপালিত জীবের মত জাবর কাটছে নিথর হয়ে। মনিবের প্রয়োজনে মুহূর্তে গর্জে উঠে ছুটে চলতে পারে ঘন্টায় সত্তর-আশী মাইল বেগে। গ্রাম-দেশে একাধিক কার না রেখে উপায় নেই। কারণ এখানে শহরের মত যাতায়াতের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কোন স্থানে থাকলেও তা গ্রামবাসীদের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। বিশ মাইল দূরে যেয়ে বাজার করে আনতে

হবে গৃহিনীকে। কর্তা হয়তো অফিস করতে যাবেন ষাট্ মাইল দূরে। ছেলে মেয়ে স্কুলে বা কলেজে যাবে—পর পর কারে করে। তাই একখানা কারে সামলায় কি করে? কিনতেই বা আপত্তি থাকবে কেন। মোটর কারের দাম প্রায় আমাদের দেশের সাইকেলের দামের মত। আমেরিকানরা যে টাকা উপার্জন করে সেই টাকার আড়াই হাজার টাকা দামের একখানা ভাল জার্মান ভক্স-ওয়াগন কেনা যায়। তিন থেকে চার হাজার টাকায় এয়ার-কণ্ডিশন্ করা বিরাট শেভরলেট বা ইম্পালা গাড়ী পাওয়া যায়। আর দুই-তিন বছরের নামে-পুরান গাড়ী তো দুশো আড়াইশ' টাকায় পাওয়া যায়। আর পেট্রলের দাম? তার থেকে আমাদের দেশে কেরোসিন তেলের দাম অনেক বেশী। আমেরিকায় ৩৬ পয়সায় এক লিটার পেট্রল পাওয়া যায় আর এদেশে একলিটার কেরোসিন তেলের দাম ১-৪০ পয়সা তাই কার কিনতে বা চালাতে কোনই অসুবিধা নেই ওখানকার মানুষের।

বাড়ীর ভিতরটা আরও সুন্দর। সমস্ত ঘরখানাই কার্পেটে মোড়ানো। হিটিং-সিসটেম্ তো থাকতেই হবে। যে বাড়ী বা ঘরে তাপ-সরবরাহের ব্যবস্থা নেই, সে বাড়ী বা ঘর বাসগৃহরূপে অনুমোদন করেন না সরকার। বেশীর ভাগ বাড়ীতেই এয়ার-কণ্ডিশন্ করা।

দেখতে দেখতে অনেকগুলি গ্রাম পার হয়ে গেলাম। রুজভেল্ট শহরের প্রান্তদেশে মিঃ ইম্‌ব্রীর বাড়ীতে পৌছালাম যথাসময়ে। মিসেস্ ইম্‌ব্রী আমাদেরকে স্বাগত জানালেন নিতান্ত আপনজনের মত। মনে হল কতদিনের চেনা।

বড় ভাল লাগল পরিবেশটা। ড্রইংরুমের মাঝখানে একটা বিলিতী ঝাউগাছ বসান। ক্রীষ্টমাস্-ট্রী (Christmas tree) বলে এটাকে। ক্রীষ্টমাস্ ডে-তে লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্রীষ্টমাস্-ট্রী বিক্রয় হয় সারা দেশে। নিতান্ত গরীব যে সে অন্তত একটা ছোট্ট গাছ হলেও কিনবে। আমাদের দেশের পাইন গাছের মাজা থেকে কেটে নিয়ে বসালে যেমন দেখায় ঠিক তেমনই দেখাচ্ছিল ক্রীষ্টমাস্

ট্রিকে। ক্রীষ্ট-মাস ট্রীর সারা অঙ্গ আলোর মালায় সাজান। রং-বেরঙের আলো—কোনটা জ্বলছে, কোনটা নিভছে; কোনটা আবার নক্ষত্রের মত্ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এই ট্রীর ডালে ডালে ঝুলছে নানা রঙের প্যাকেট। এই দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব প্রিয়-পরিজন পরস্পর পরস্পরকে নানারকমের উপহার দিয়ে থাকেন, যেমন আমাদের দেশে দুর্গাপূজা বা দীপাবলীতে হয়ে থাকে। বস্ত্র আভরণ, সৌখীন সামগ্রী, বই, খেলনা—যার যা সাধ্য তাই উপহার দেন পরিবারের সকলকে ও আত্মীয়-পরিজনকে। উপহারের প্যাকেটগুলি টাঙ্গিয়ে রাখা হয় ঐ ট্রীর ডালে। পরদিন গৃহকর্তা সেগুলি খুলে নিয়ে যেটা যার তাকে সেটা দিয়ে দেন। শিশুদেরকে বলা হয় যে সান্টাক্লজ গভীর রাত্রে চিমনীর ভিতর দিয়ে নেমে তাদের জন্য রেখে গেছে।

ঐ দিনের মধ্যরাত্রিটি বড়ই সুন্দর। দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নতুন সাজসজ্জায় সেজে চার্চে যান প্রার্থনা করতে। সমস্ত চার্চে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে ঘোষিত হয় প্রভু যীশুর জন্ম-লগ্ন। পথে পথে ভক্তের দল "ক্যারোল" গাইতে গাইতে পরিভ্রমণ করেন নানা পাড়া। এদের মধ্যে একজন লাল পোষাক পরে, সাদা দাড়ি—ও পাগড়ী মাথায় দিয়ে সান্টাক্লজ সাজেন।

একবার আমাদের স্পেন্সারদাকে সান্টাক্লজ সাজানো হল। লম্বা মানুষ। পেটের ভলিউমটা বাড়িয়ে বিরাট ভুঁড়ি তৈরী করা হল—আলখেল্লার তলে অন্যান্য জামা-কাপড় গুঁজে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে সাদা দাড়ি ও মাথায় লাল-সাদা রঙের পাগড়িতে অপূর্ব দেখাচ্ছিল স্পেন্সারদাকে। আমরা প্রায় চল্লিশজন ছেলেমেয়ে স্পেন্সারদাকে সামনে রেখে ক্যারোল গাইতে গাইতে ঘুরে এলাম নিউইয়র্কের সিক্স্থ্ অ্যাভিনিউ-এর আশেপাশের বেশ কিছু অংশ। রাস্তার দুধারের বাড়ী থেকে মানুষ দেখতে লাগল আমাদের সান্টাক্লজকে। অনেকে তাদের শিশুদেরকে সান্টাক্লজের স্বরূপ দেখাবার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ করে বসালেন আমাদেরকে। শিশুরা উপভোগ করল

আমাদের সান্টাক্লজকে। তারা জানে সান্টাক্লজ তাদের একজন বড় বন্ধু।

মিঃ ইম্‌ব্রীর ছোট্ট শিশুকন্যাটি অদূরে দাঁড়িয়েছিল। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে ভাব জমে উঠল আমার। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ছোট্ট নিজস্ব জগতে—তার খেলার ঘরে। মাঝারি ধরণের একখানা ঘর। কার্পেটে মোড়া। একধারে আলমারীতে নানা গল্পের ও ছবির বই। খেলনার বাহার দেখে অবাক। নানাধরণের খেলনা। রকিং হর্স থেকে শুরু করে টকিং ডল, মোটর কার রকেট, ছোট ছোট ডল—নানা দ্রব্যের সমাহারে এটা যেন মিন্নুর 'মিনি' সংসার। তার যখন খুসী সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে মসগুল হয়ে থাকে এই সংসারে। ভেবে অবাক হতে হয় যে এদেশের অভিভাবকগণ একটা শিশুর পেছনে কত পয়সা খরচ করেন—তার বোধ ও স্বাধীন সত্তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য।

মিসেস্ ইম্‌ব্রী ডাক দিলেন লাঞ্চের জন্য। রান্নাঘরে যেয়ে দেখি সে যেন ছোটখাট এক রাজসূয় যজ্ঞ। বিশ ফুট লম্বা টেবিলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত নানা-রকমের খাদ্য সামগ্রী নানা-ধরণের ট্রে-তে সাজানো। বিরাট এক কেক্, শোভা পাচ্ছে একপ্রান্তে! বোধ হয় এটাকেই ক্রীষ্টমাস কেক্ বলে। তার পাশে ভীড় করে আছে আপেল, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, পীচফল, প্লাম, কলা, নানা-ধরনের বিস্কুট ও "পাই"! সিদ্ধ ব্রকলী, বীন, ফুলকপি, গাজর, ভুট্টা, স্লাইস্‌ড লোফ্ নানা-ধরণের ফলের রস,—কোনটা হলদে, কোনটা লাল, কোনটা সাদা, কোনটা আবার নানা রঙের—নিজ নিজ আসন দখল করে আছে। তাদের পাসেই নানা জাতের "ড্রিঙ্ক"—স্যাম্পেনা, হুইস্‌কী, র‍্যাম, বীয়ার কত কী! এছাড়া আছে সাওয়ার ক্রীম, দুধ, জ্যাম, জেলী প্রভৃতি। সবার মধ্যমণি রূপে শোভা পাচ্ছে বিশাল বপু এক টার্কীশ মোরগ। ও যদি জীবন্ত হতো তাহলে কীচেন লণ্ড-ভণ্ড ক'রে ফেলত এতক্ষণে। চোখ বুজে পড়ে আছে ট্রে-র ওপরে।

এর পেটের ভেতরে ভরা আছে নানা মশলা। যে আসছে সেই একটা অংশ কেটে নিয়ে পুরে দিচ্ছে তার মুখে।

ভাবগতিক দেখে সুবিধার মনে হলো না। একটা আপেল ও একটা পীচফল তুলে নিয়ে এসে বসলাম সোফাতে। আস্তে দুই-এক কামড় মুখে নিয়ে মুখ নেড়ে সময় কাটাতে শুরু করলাম।

মিঃ ইম্‌ব্রী একখানা কাগজের প্লেটে একপিস্ কেক্ আমার সামনে ধরলেন। বল্লেন, **Mr. Biswas it's a famous cheese cake, very delicious ; please have it.**

[মিঃ বিশ্বাস, এটা বিখ্যাত চীজ কেক্! খুব সুস্বাদু। একটু খেয়ে দেখ]

চীজ কেকের গুণকীর্তন আগেও শুনেছি। টেষ্ট করার লোভ যে হল না তা নয়। তবে নীতিবোধতো টনটনে। তাই বল্লাম,—

Does it not contain egg, Mr. Imbri ? (এতে ডিম নেইত মিঃ ইম্‌ব্রী)

—**Oh no ! no ! It is made in Philadelphia. It does not contain egg—so far I have heard.** [না না ! এটা ফিলাডেলফিয়াতে তৈরী। আমি যতদূর শুনেছি এতে ডিম নেই।]

হাতে নিয়ে মুখে দিলাম বিখ্যাত চীজ কেক্। স্বাদ তো অনাস্বাদিত। বেশ ভালই লাগল খেতে! কেক্ গলার তলে নেমে গেলে গবেষণা শুরু করলাম—এতে ডিম নেই তো? গণভোটে স্থির হল ডিম থাকতেও পারে। কি করি উপায়? খাবার সময় তো ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না যে এতে ডিম আছে। থাকলেই বা এখন কি করি? সরল বিশ্বাসে খেয়ে নিয়েছি মিঃ ইম্‌ব্রীর শ্রদ্ধার দান! ভাবলাম একদিন হবিষ্যান্ন করে নেব। জোড়াতালি দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে। মানুষ বোধ হয় তার দুর্বলতাকে এমনভাবেই সমর্থন করে!

যাহোক, সারাদিন কাটল খুব আনন্দেই—গল্পে, গানে, ঠাকুর

প্রসঙ্গে। বিদায়ের সময় এল। মিসেস্ ইম্‌ব্রী আমায় কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথায় স্নেহের স্পর্শ এঁকে দিলেন। গুরুজন সম্পর্কের এই নাকি নিয়ম। সবার সঙ্গে যথাযোগ্য কার্টসী বিনিময় হল। মিঃ ইম্‌ব্রী আমাদেরকে টু্হোল বাসস্ট্যাণ্ডে পৌছে দিয়ে গেলেন।

সাধারণতঃ ছয় সপ্তাহের মধ্যে outline-এর ফলাফল সরকারী-ভাবে জানা যায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম ঘটল। ব্যতিক্রম অতিক্রম করতে শুরু থেকে এই পর্যন্ত যে লড়াই করতে হচ্ছে তা সবিশেষ বর্ণনা করলে পাঠকগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে আমার আউট-লাইন ভুলবশতঃ হিষ্টরি-ক্যাল কমিটির কাছে পাঠান হয়েছে। দেড়মাস পরে সেখান থেকে ফিরে এলে আবার তাকে পাঠান হয়েছে ফিলসফিক্যাল কমিটির কাছে। তাই আরও দেড় মাস অপেক্ষা করতে হল আমাকে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সাল—আমার থিসিসের আউট-লাইন অনুমোদন লাভ করল। এবারে থিসিস্ লেখার পালা। এই তিন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্য তন্ন তন্ন ক'রে পড়ে ডাটা (data) সংগ্রহের কাজ শেষ করে নিয়েছি। এখন সেগুলিকে যথাস্থানে বসিয়ে বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে।

সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীরা তিন বৎসর সময় নেয় থিসিস্ লিখতে। দুই বৎসরের কম সময়ে কেউ নাকি থিসিস্ সাবমিট করে না! আরও দু-বছর? মন মানল না! ভাবলাম এই দুই বছরে কত কি ঘটে যেতে পারে! দেশে বৃদ্ধা মা, বাবা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই আছেন ও আছে। কখন কার কি ঘটে তা কে জানে? শ্রীশ্রীবড়দা ও হয়তো আশা ক'রে বসে আছেন কবে তাঁর এ দীন সেবক তাঁর কাছে ফিরে যাবে। কোন্ পরিস্থিতির চাপে কখন আমায় ভারতে ফিরে যেতে হয় তা কে জানে? আর একবার ফিরে গেলে আবার যে স্টেটে আসা হবে সে দুরাশা আমার নেই। তাছাড়া শুভ কোন কিছু আরম্ভ করে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে সময় অতিবাহিত করা

দয়াল ঠাকুরও পছন্দ করতেন না। তাই স্থির করলাম প্রথম যে চান্স পাব তাতেই থিসিস জমা দেব।

খোঁজ নিয়ে জানলাম ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে যে সমাবর্তন হবে তাতে যদি ডিগ্রী নিতে হয় তাহলে সামনের ২রা জুন থিসিস্ সাবমিট করতেই হবে।

চাকরি রাখব কি ছেড়ে দেব এই নিয়ে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। চাকরি করে থিসিস্ লিখতে গেলে তিনবছরেও লিখে শেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ। ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত মাত্র চার ঘন্টায় চাকরি। কিন্তু তার আগে প্রস্তুত ও পিছনে বিশ্রাম নিতেই আর তিন-চার ঘন্টা মারা যায়। তাছাড়া হয়তো ভোরে উঠে লিখতে বসেছি। লেখার ফ্লো এসেছে। এমন সময় অফিসে যাবার তাগাদা এল। তখন লেখা ছেড়ে উঠতে অস্বাভাবিক মানসিক অস্বস্তি হয়। আর ঐ ভাবটা কেটে গেলে, সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে, সেই ভাব ফিরে পেতে আরও কত ঘন্টা যে অপেক্ষা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। তাই চাকুরীতে ইস্তফা দেব স্থির করলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী যারা তারা অবশ্য চাকরি না ছাড়বার পরামর্শই দিলেন। সকলেই এক কথা বল্লেন, চাকরী ছেড়ে দিলে তোমার পেট চলবে কেমন করে? বরং চাকরি রেখে ধীরে-সুস্থে থিসিস শেষ, তাতে লেখাও ভাল হবে, কোন কষ্টও হবে না। তাছাড়া এখন এখানে ইকনমিক রিসেজ চলছে, এখন কেহ কি স্থায়ী চাকরি ছাড়ে?

হাউজারম্যানদা চলে গেলেন ভারতে। হরিনারায়ণও গেল তার সঙ্গে। চার মাস পরে ফিরবে। আমি একা রইলাম 7th ষ্ট্রীটের ঐ অ্যাপার্টমেন্টে।

প্রথমে ছুটি নেবার চেষ্টা করলাম। আমার বিভাগীয় প্রধান একজন চাইনীজ ভদ্রলোক। তিনি দুই সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করে-ছিলেন আউট-লাইন লেখার সময়। কিন্তু এখন আর ছুটি মঞ্জুর করতে রাজী নয়। যদিও নো-ওয়ার্ক, নো-পে।

সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সনেল অফিসে যেয়ে হাজির।

আমাকে দেখেই কর্মরতা মহিলা বলে উঠলেন—Hallow Mr. Biswas. You have a good news. You have got promotion. [হ্যালো মিঃ বিশ্বাস। তোমার সুসংবাদ আছে। তোমার প্রমোশন হয়েছে]

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বল্লাম, I am sorry Miss. I want to resign. [আমি দুঃখিত মিস্। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিতে চাই]

ভদ্রমহিলা বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বল্ল, Are you kidding? Oh no. You cannot give up the job of 130 dollars a week—particularly in this period of economic recess. You better think again before take any decision. [তুমি কি ছেলেমানুষী করছ নাকি? সপ্তাহে ১৩০ ডলার মাইনের চাকরি তুমি কিছুতেই ছাড়তে পার না। বিশেষ করে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে । তুমি বরং সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাল ক'রে চিন্তা করে দেখ।]

'তোমার বান্ধবোচিত পরামর্শের জন্য তোমায় ধন্যবাদ' বলে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। ভারতীয় মুদ্রায় সপ্তাহে একহাজার টাকা বেতনের চাকরিটি ছাড়তে মনে যে দোলা লাগল না তা নয়। হাউজারম্যানদার কথাটা কানের কাছে ফিরে ফিরে বাজতে লাগল, "খাবে কি?"

সত্যই তো খাব কি? একা মানুষ! ঘরভাড়া ৩৫ ডলার। খাওয়া-খরচা ইত্যাদিতে আরও ৪০ ডলার তো লাগবেই। প্রতিমাসে এতগুলি ডলার কে জোগাবে আমাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে বল্লাম—দয়াল চাকরি রেখে থিসিস্ লিখলে কত বছরে যে তা শেষ হবে, তা তুমিই জান। আর চাকরি ছেড়ে দিলে কি খাব তাও তুমিই জান ঠাকুর! দয়াল! তুমি বলে দাও কি করব?

মনে জোর পেলাম! বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল:

ভাবছ ব'সে চলবে কিসে
ভাববার তুমি কে ?
ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি
ভাব তুমি তাঁকে ।

ফোনের রিসিভার তুলে নিলাম হাতে। পার্সোনেল অফিসের ডাইরেক্টরকে জানিয়ে দিলাম : Please accept my resignation. It is not possible for me to continue in service. Thank you. [আমার রেজিগনেশন গ্রহণ করুন। বর্তমান চাকরি করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ধন্যবাদ]

সব শেষ! এখানে সাধারণ চাকরিতে কোন লিখিত নিযুক্তিপত্র দেয় না। তাই চাকরি ছাড়তেও লিখিত resignation letter দেবার প্রয়োজন পড়ে না। মুখের কথাই যথেষ্ট। একমাত্র বড় বড় চাকরি—যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি পদের জন্য যেখানে কনট্রাক্ট সিস্টেম আছে, সেখানে কাগজ ও কালির প্রয়োজন হয়। এসব পদের বেতন সাধারণত মাসে ১৩০০ ডলার থেকে শুরু হয়।

শুরু হল লেখা। ভোরবেলায় উঠে চলে যাই রিলিজিয়াস সেন্টারে। বেলা বারটা কখনও বা একটা নাগাদ ফিরে এসে ছটো রান্না করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব-শেষ করি। বেলা তিনটায় আবার চলে যাই ঐ সেন্টারে। সঙ্গে নিয়ে যাই ছোট্ট একটা টিফিন বক্স। তাতে থাকে ভাত, আলু-কোপি বা আলু-মাসরুমের তরকারী। রাত্রি গোটা নয়েকের সময় ঐটুকু খেয়ে জলযোগ করে পেটটা পূর্ণ করে ফেলি। এতে ক্ষুধাও মরে, পেটও ভরে আবার শরীরও হালকা থাকে। রাত্রি বারটা-একটা পর্যন্ত লিখে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসি।

অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে লেখা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথমত: হাউজারম্যানদার সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের সঙ্গে "হ্যালো! হায়!" ইত্যাদি করতেই হয়। তাদের নানা প্রশ্নের

জবাবও দিতে হয় অনেক সময়। এছাড়া আছে কানের কাছে ফোনের দৌরাত্ম্য। কতবার যে ফোন বেজে ওঠে তার হিসাব নেই ' এতবা'' ফোনের জবাব দিতে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। আর তখনই লেখার ধারা যায় কেটে। তাই চলে যাই রিলিজিয়াস সেন্টারে।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ২নং ওয়াশিংটন স্কোয়ার, নর্থ বিল্ডিং-এর চারতলার ওপরে একখানা সুন্দর সাজান ঘর। এক-একখানা ঘর, এক-এক ধর্মমতের অনুরাগী ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও মত বিনিময়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ একই মতানুগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একটা বিশেষ সীমা পার হলে তবেই তাদের জন্য একখানা ঘর মঞ্জুর হয়। প্রত্যেক ঘরে লাইট, ফ্যান, ফোন, বাথরুম, ল্যাট্রিন প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। এছাড়া গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আছে বিরাট হলঘর। তার সঙ্গে "কিচেন" ও ডাইনিং হল। যে-কোন গ্রুপ যে-কোনদিন বৃহত্তর সমাবেশ বা সাধারণ সভার জন্য ব্যবহার করতে পারে এই হল। এই সব পরিচালনার ভার বিভোর আনন্দের ওপরে। সে এই রিলিজিয়াস সেন্টারের রেসিডেন্ট ম্যানেজার। তারই প্রচেষ্টায় আমি একজন মাত্র সৎসঙ্গী ছাত্র হয়েও সৎসঙ্গের (পাবনা) নামে একখানা ঘর পেয়েছিলাম। আমার ঘরের পাশেই রোহিণী সৎসঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট ঘর।

ঘরের এক কোণে ছোট টেবিলে পরমদয়াল ঠাকুরের ট্রাই-কলার ফটোখানা সুন্দর ভাবে সাজান। দুই বেলায় ধূপের গন্ধে—কদাচিৎ শ্বেতপুষ্পের সৌরভে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয় ঐ ঘরে। নিত্য প্রার্থনা করেছি এই ঘরে বসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসে তাদের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ করার জন্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীকে অধ্যাপকগণ পাঠিয়ে দেন আমার কাছে—তাদের নানা প্রশ্নের জবাবের জন্য।

একদিন একটা মেয়ে এসে অদ্ভুত প্রশ্ন করল। বল্ল—তোমাদের দেশের মেয়েদের এত দূরাবস্থা কেন ? তারা পরাধীন। নিজেদের

ইচ্ছামত কোন কিছু করার অধিকার তাদের নাই। সবসময় রান্না-ঘরে দাসীর মত বন্দী থাকে। দেখ আমরা কত ফ্রী! আমরা যা ইচ্ছা, তাই করতে পারি। যেখানে খুশী যেতে পারি। আমরা কারও দাসী নই, বা ঘরে বন্দীও নই। আরও নাকি আছে—স্বামী বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রী এক ঘটি জলে তার বুড়ো আঙ্গুলটা ডুবিয়ে নেবে ও সেই জল খাবে? বড় দুঃখ হয় এই সব মেয়েদের জন্য। আমাদের দেশের মত উইমেনস-লিবারেশন-মুভমেন্ট (Womens Liberation Movement) আরও জোরদার হওয়া উচিত তোমাদের দেশে।

শেষের কথাগুলি শুনে না হেসে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, এসব সংবাদ তুমি কার কাছে পেলে?

—আমার প্রফেসার বলেছেন।

বিরূপ মন্তব্য করতে পারলাম না। তাতে অধ্যাপকের প্রতি অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই বল্লাম,—তিনি বলেছেন এক, আর তুমি শুনেছ আর এক!

মেয়েটি চুপ ক'রে রইল। বল্লাম—ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনেছ?
—হ্যাঁ।

—তিনি কে?

—ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী!

—তিনি পুরুষ না স্ত্রীলোক? মেয়েটি হেসে বল্ল—She is a woman. [সে একজন স্ত্রীলোক]।

—তোমাদের দেশে কোন মহিলা প্রধানমন্ত্রী আছে নাকি? সেনেটের ক'জন সদস্য মেয়েমানুষ? একটু গম্ভীর ভাব নিয়ে বল্লাম—শোন! আমাদের দেশের মেয়েরা রান্নাঘরে খুন্তি হাতে নিয়ে রান্না করে একথা ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজন হলে অসি হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। অশ্বের বল্গা ধ'রে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না তারা! ·····আপাতঃদৃষ্টিতে তাদেরকে পরাধীন মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা রান্না ঘরে রান্না করা, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, পরিবার-পরিজনের সেবা

করাকে দাসত্ব মনে করে না। বরং এই করার মাধ্যমে স্বামীর তুষ্টির সাধনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাছাড়া কুমারী অবস্থায় পিতা-মাতার অধীন থাকে। বিবাহ হলে বধূ অবস্থায় স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ির অধীন থাকে। কিন্তু যেই সে সন্তানের মা হয় অমনি **She becomes the queen to rule over the whole family.** [সে সংসারের সম্রাজ্ঞীতে রূপান্তরিত হয়ে গোটা সংসারকে পরিচালনা করে। তাই আমাদের দেশের মেয়েদের নিরাপত্তা বোধ (Sense of security) অনেক বেশী।···ইত্যাদি।

মেয়েটি নিবিষ্ট মনে শুনছিল আমার কথা। বোধহয় মনে গভীর দাগ কেটেছে তার। তার অজান্তে তার চোখের পাতা ভরে উঠেছে জলে। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বল্ল—**I wish I were born as an Indian woman.** [আমি যদি ভারতীয় মহিলা হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম।]

কোনমতে একটা অধ্যায় (chapter) খাড়া করলাম লিখে। আমার সহপাঠি ও সহকর্মী "জন" নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করলাম। "জন" অনেকদিন শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপরে গবেষণা করার ইচ্ছা তার।

জন আমার ঐ এক অধ্যায় পড়েই হতাশ হয়ে বল্ল—ভুল! সব ভুলে ভরা। হাজার হাজার ভুল। বড় বড় বাক্য। কাঠামোগত ও ভাবাগত ভুল। আপত্তিজনক অভিব্যক্তি। এতে চলবে না।

চ্যাপটারটি খুলে দেখি প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রতিটি লাইন লাল দাগে ভরা। সবই ভুল নাকি! আমার চোখ তো ছানাবড়া। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে যদি গরু সম্বন্ধে ইংরাজীতে রচনা লিখতে দেওয়া হয় তবে সে-ও তো এত ভুল করবে ব'লে মনে হয় না। আর আমি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ ক'রে দু-পাতা শুদ্ধ লিখতে পারলাম না! লজ্জার কথা! ভাল করে প'ড়ে দেখি যে 'My was a dog' লিখি নাই বটে, তবে যা লিখেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে ইংরাজী ভাষায় শূন্য মার প্যাঁচ

এখনও আমার অজানা। টেকনিক্যাল ডিফেক্ট এর জন্য আমি নির্দোষ দাবী করলে সওয়াল করার জন্য উকিলের প্রয়োজন হবে না। কারণ থিসিসের ভাষার যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈধী ধারা আছে তা যে কোর্সে শেখান হয়, সেই ডিসার্টেশন-প্রোপোজ্যাল—সেমিনার-এর ক্লাস আমাকে করতে হয় নি।

খুব সহানুভূতির সঙ্গে ভুলগুলি ধরিয়ে দিল জন! আর বল্ল: দেখ মিঃ বিশ্বাস। চাকরি ছেড়ে তাড়াহুড়ো করে—লিখবার কোন অর্থ নেই। তুমি যত ভালই লেখ না কেন—তিন মাসের মধ্যে থিসিস্ লিখে তিনজন পরীক্ষকের অনুমোদন লাভ করা একেবারেই অবাস্তব। তাছাড়া তোমার লেখাতে ভাষার এত ভুল যে অধ্যাপকগন বার বার রি-রাইট করতে বলবেন। তাতেই লেগে যাবে কমপক্ষে দুই বৎসর। তার পরে বিষয়বস্তুর প্রশ্ন। তার চাইতে ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আমি তবুও জেদ ধরে বল্লাম—২রা জুনের মধ্যে আমি থিসিস্ জমা দেবই। তুমি আমায় একটু সাহায্য করলেই পেরে যাব। তুমি শুধু—

কথা শেষ করতে দিল না জন। চোখ দুটি গোলা গোলা করে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমিও আর কিছু বলতে পারলাম না। আমাকে পাগল (crazy) ভাবতে তার ভালবাসার তন্ত্রীতে যে টান লাগছে তা তার চোখের চাহনীতে ফুটে উঠল। জোর দিয়ে বলে উঠল—If something more than miracle happens then it may be possible, otherwise it is absurd and crazy [যদি অলৌকিক অপেক্ষাও বৃহত্তর কিছু ঘটে তবে হয়তো এটা সম্ভব হতে পারে। তা নাহলে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও পাগলামী]

বলাবাহুল্য—প্রথম চ্যাপটার পড়েই 'জন' এমন হতাশ হয়েছে যে, গোটা থিসিস দেখে দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রক্ষা করতে পারল না। বুঝলাম ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক

হবে তার পরিশ্রম ; ভেবেই 'সময় নেই' বলে এড়িয়ে চলে গেল। তবে ¨ন যে দুখানা বই দিয়েছিল তাতে আমার যথেষ্ট উপকার হল। টেকনিক্যাল ডিফেক্টগুলি সম্বন্ধে সচেতন হলাম।

মাঝ-দরিয়ায় নৌকো বিপন্ন হলে মাঝি যেমন মরিয়া হয়ে হাল ধরে আমারও ঠিক তেমনই অবস্থা। অসম্ভাব্যতার অকূল পাথারে আর কোন কাণ্ডারী—অধ্যাপক, বন্ধুবান্ধব, আপন জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা কোনটারই সহায়তা না পেয়ে আমার অকূলের কূল যিনি, সেই দয়াল ঠাকুরকে ভরসা করেই থিসিস লেখা শুরু করলাম।

থিসিস লেখা শেষ যে হল কিভাবে, তা আজও ভেবে পাইনা। আজ এই প্রবন্ধ লিখতে বসে থিসিস লেখার পটভূমিকাকে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ভাবার দৈন্যতা, টেকনিক্যাল জ্ঞানের অজ্ঞতা, দারিদ্রের পীড়ন, সময়ের পাহাড়-প্রমাণ চাপকে অতিক্রম করে কিভাবে যে থিসিস্ লিখে শেষ করলাম তা বাস্তববাদীদেরকে খুশী করার মত ভাবায় বলা দুষ্কর। তবে ঘটনা যেটুকু ঘটেছে তাই লিখলাম মাত্র।

নাম করতাম অনবরত। সময়ে-অসময়ে বিশেষ করে লিখবার আগে বসে পড়তাম শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে। আকুল হয়ে নাম করতাম আর চিন্তা করতাম তাঁর ঐ ভুবনমোহন রূপ। কিছুক্ষন নাম করতেই কেমন যেন করে উঠত শরীরের মধ্যে। সে ভাব অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। উঠে বসতাম লেখার জায়গায়। হাতে লিখতাম না। টাইপ রাইটারে একবারে টাইপ করতাম। কোন্ পয়েন্টের পর কোন্ পয়েন্ট লিখব তা চিন্তা করতাম না। চিন্তা করতাম তাঁর রাতুল চরণ দুখানি আর তাঁর ঐ নির্দেশ—'তুই শালার ডক্টরেট হবি নে'? নাম করতাম গভীর আবেগের সাথে। স্রোতধারার মত চিন্তার ঢেউ খেলে যেত মাথায়। মনে হত কে যেন রাশ ঠেলে দিচ্ছে মাথার ভেতরে বসে। টাইপ করে যেতাম—যা মনে আসত তাই। যতক্ষণ এই ভাব থাকত ততক্ষন লিখতাম। পরে যখন পড়তাম, নিজেই অবাক হতাম ভেবে—এমন

সুসম্বদ্ধ চিন্তার ধারাবাহিকতা কি ক'রে ফুটে উঠল ভাষায়? লেখার শেষে আবার প্রণাম করতাম তাঁর প্রতিকৃতির সামনে। বার বার মনে পড়ত তাঁর সেদিনের সেই বরাভয় অভিব্যক্তি—There are many things between heaven and earth than that can be dreampt of your Philosophy Horatio'. [স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে এমন বহু জিনিষ ঘটে যায় যা তোমার দর্শনের পাল্লায় ধরা পড়ে না।]

১৬ই মে সংবাদ পেলাম ডঃ পেরী গ্রীষ্মের ছুটিতে বাইরে চলে যাবেন। সর্বনাশ! পরের দিনই দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। ডঃ পেরী বল্লেন, If you can give me your thesis on the 20th May, I will try to go through and give you back on the 26th. [তুমি যদি ২০শে মে'র মধ্যে তোমার লেখা আমায় দিতে পার তাহলে আমি চেষ্টা করব প'ড়ে ২৬শে মে ফেরৎ দেবার।]

সে এক প্রাণান্ত অবস্থা! চার দিনেরও কম সময় হাতে! শেষ অধ্যায় অর্থাৎ কনক্লুশন্ এখনও লেখা হয়নি। এর মধ্যে টাইপ করতে হবে ২৪০ পৃষ্ঠা লেখা। তিন কপি দিতে হবে তিনজন অধ্যাপককে! তারা অনুমোদন করলে আবার ফ্রেশ টাইপ ক'রে জমা দিতে হবে ২রা জুন!

১৮ ঘণ্টারও বেশী সময় বসে আছি টাইপরাইটার মেশিনের সামনে। সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিনা। এখন-আর রিলিজিয়ন সেণ্টারে যাই না। কারণ আপ্যার্টমেণ্ট শূন্য। হাউজারম্যানদা, হরিনারায়ণ ভারতে। স্পেন্সারদা আমাদের সঙ্গ ছেড়েছেন বেশ কিছুদিন। কিছুদিন আগে আমরা জার্নী নামক সংস্থার বিল্ডিং-এ ছিলাম। সেখান থেকে আমরা আবার এই সেভেন্থ স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে আসি। সেই সময় হাউজারম্যানদার সঙ্গে স্পেন্সারদার মতান্তর হওয়ায় তিনি আমাদের সঙ্গে আসেন না। কখন কোথায় যে থাকেন তাও জানিনা।

দুটি নূতন রুমমেট হয়েছে। আমাদের কুষ্টিয়ার নারায়ণ কর্মকার

ও চাকদহের বিকাশ বোস। দুজনই আমাদের গুরুভাই। দুজনেই ইঞ্জিনীয়ার—। হালফিল এদেশে এসেছে—বেটার চান্সের আশা নিয়ে। আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে—সহযোগিতাও করেছে অনেক।

রান্না-খাওয়ার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছি। চাল, ডাল, আলু, ফুলকপি, ব্রকলী, ব্রাসেল স্প্রাউট, টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা, লবণ, হলুদ, একটু চিনি ও খানিকটা মাখন তাতে ফেলে দিয়ে একসঙ্গে বসিয়ে দিতাম গ্যাসষ্টোভে। পনের মিনিটের মধ্যে রান্না হয়ে যেত। খেতেও বেশ সুস্বাদু হতো। ওরাই কে একজনে নাম দিয়েছিল "থিসিস কারী"। দুই বেলাতেই চলত এই থিসিস কারী। সকালে বিকালে দুধ আর পাঁউরুটী। সহজ ব্যবস্থা।

যথাসময়ে টাইপ শেষ করে তিন কপি জমা দিয়ে এলাম অধ্যাপকদের কাছে। "কনক্লুশন" যে লিখতে বাকী তা তাঁদেরকে জানিয়ে এলাম। আনন্দকে সংবাদ দিলাম—ডঃ পেরী, ডঃ জনসন্ ও ডঃ বেলফোর্ডকে তিনকপি থিসিস দিয়ে এলাম। আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে বলল—সাবাস! তুম্ কামাল আদমী হ্যায়। —হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল আনন্দ। ভারী গলায় বলল—একটা ভুল করেছ! ডঃ পেরীকে গাইডিং প্রফেসার হিসাবে সিলেক্ট করে বোধ হয় ঠিক কর নাই!

বাধা দিয়ে বললাম—তাতে আর ভুলের কি হলো?

আনন্দ—ডঃ পেরী লোক হিসাবে খুবই ভাল লোক। তবে পরীক্ষক হিসাবে খুবই কড়া। এক চান্সে কোন থিসিসই অ্যাপ্রুভ করেন না! তোমাকে আটকে দিতে পারেন!

আমি—কিন্তু তিনি তো আমাকে খুবই স্নেহ করেন! আমাকে অত হাজার টাকা স্কলারশিপ দিলেন! আনন্দ প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির ভঙ্গিতে বলল—তাতে কিছু এসে যায় না। লোক হিসাবে ডঃ পেরী খুবই সহৃদয়। কিন্তু পরীক্ষক হিসাবে দু-বারে কোন থিসিস খুব কমই অনুমোদন করে থাকেন। তোমাকে হয়তো তিনবার লিখতে হতে পারে—হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বলে ফেল্লাম—Listen

Ananda ! If my Thakur desires me to have the degree in this June term, Dr. Perry has to approve my thesis at the 1st chance. [শোন আনন্দ, আমার ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় যে আমি এই জুন-টার্মেই ডিগ্রী পাই তবে ডঃ পেরীকে অনুমোদন করতেই হবে এই প্রথম বারেই।]

আমার হাতদুটো সজোরে চেপে ধরে বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বলল আনন্দ—You have such a conviction Rebati! Your faith will help you! I wish I could have such faith by the grace of Thakur! [রেবতী তোমার এত গভীর বিশ্বাস! তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সাহায্য করবে! ও ঠাকুরের করুণায় আমার যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকত!]

নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেলাম ডঃ পেরীর সঙ্গে। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে! কি জানি যদি অনুমোদন না করেন! "দয়াল তোমার যা ইচ্ছা" বলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম।

সস্নেহ-সম্ভাষণে স্বাগত জানিয়ে বললেন—নমস্তে মিঃ বিশ্বাস। হ্যাভ ইওর সীট প্লীজ! প্রথমে জাতীয় কায়দায় নমস্কার ও পরে পশ্চিমী কায়দায় হ্যাণ্ড সেক করে আসন গ্রহণ করলাম। ডঃ পেরী টুকিটাকী জিজ্ঞাসা করলেন—Did your Thakur know Latin? How could he use so many French terms. Did he have mastery over so many languages? [তোমার ঠাকুর কি ল্যাটিন ভাষা জানতেন? তিনি এত ফরাসী শব্দ ব্যবহার করলেন কেমন করে? তিনি এতগুলি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন?]

বল্লাম—কোন্ বিষয়ে যে তাঁর পারদর্শিতা ছিল না তা বলা মুস্কিল!

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ডঃ পেরী বললেন—One chapter of your thesis has been very weak. You have committed in your proposal that you will compare the

doctrines of Sri Sri Thakur with those of Jesus Christ. But you didn't. [তোমার থিসিসের একটি অধ্যায় খুব দুর্বল হয়েছে। প্রোপোজালে লিখেছ তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের মতবাদের সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের মতবাদের তুলনা করবে। কিন্তু থিসিসে তা কর নাই।]

আমি বল্লাম—How can I compare the vast Pacific Ocean with the Hudson river ? [বিরাট প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে হাডসন নদীর তুলনা কিভাবে করব ?]

ডঃ পেরী বোধ হয় এই উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। বিস্ময়ের সঙ্গে গর্জে উঠলেন—"What" [কি বললে] ?

আমি বললাম—How can I compare the vast Pacific Ocean with the little Hudson river ? Of course, I don't mean that Sri Sri Thakur is the Pacific Ocean and Jesus Christ is the Hudson river. I mean to say that Thakur's literature is as vast as the Pacific Ocean where as the literature of Christ is just like a little brook. [বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে ক্ষুদ্র হাডসন রিভারের তুলনা কিভাবে করব ? অবশ্য আমি বলছিনা যে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত মহাসাগর আর ক্রাইষ্ট হচ্ছেন হাডসন রিভার। আমার বলার উদ্দেশ্য যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্য হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিশাল আর ক্রাইষ্টের সাহিত্য ছোট্ট নদীর মত স্বল্পপরিসর।] যেমন, বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের ওপরে ক্রাইষ্ট বলেছেন মাত্র কয়েকটা বাক্য আর শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠা। স্যার ! দুই হাজার পৃষ্ঠার সঙ্গে দুই কি তিনটি বাক্যের তুলনা কিভাবে করব ?

ডঃ পেরী একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি কারণ উল্লেখ করেছ ঠিকই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে মৌখিক পরীক্ষার সময় এই

চাপ্টার নিয়ে অসুবিধায় পড়তে পার। তুমি বরং তোমার চেয়ার-ম্যান ডঃ বেলফোর্ডের সঙ্গে কথা বল এ বিষয়ে।

থিসিসের কপিখানা আমার দিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন—**O. K. Mr. Biswas. We are expected to meet together, in September!** [ঠিক আছে মিঃ বিশ্বাস। সেপ্টেম্বর মাসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।] বুকের মধ্যে ধপ্ ক'রে উঠল। হৃদ্‌পিণ্ডের গতিবেগ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত আনন্দের আশঙ্কাই সত্য হল!

ডঃ পেরীকে তো দোষ দেওয়া যায় না! নিয়ম হচ্ছে কিছু অংশ লেখা আর পরীক্ষকদের (guide)-কে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া! আমি "ষ্টেজে মেরে দেওয়ার মত একবারেই আসরে পাঠিয়েছি। তাছাড়া সত্যই তো আউট-লাইনের অনুরূপ লেখা হয় নি! কিন্তু তাই বলে কি অক্টোবরে ডিগ্রী পাব না? ডঃ পেরী যে সেপ্টেম্বরে দেখা করতে বল্লেন?

সমস্ত শরীর হিম-শীতল হয়ে উঠল মুহূর্তে। মনে মনে খুব নাম করছি। অন্তরের গভীরে গাঢ়তম আবেগ নিয়ে ইষ্টনাম জপ করছি। অসহায়া দ্রৌপদীর মত আর কোন পথ না পেয়ে আকুল হয়ে দয়াল ঠাকুরকেই ডাকছি। ডঃ পেরী বার দুই আমার দিকে তাকালেন - তার ব্রীফকেস গোছাতে গোছাতে! বোধ হয় ইঙ্গিত করছেন—**You may come now.** [তুমি এখন আসতে পার]

তৃতীয়বার আমার চোখে তাঁর চোখ পড়তেই বললাম, ঠিক আছে স্যার! সেপ্টেম্বরে আপনার সঙ্গে দেখা করব! কিন্তু আপনার সই পাব কি করে স্যার?

—**Oh yes! Give me your pen**—[হ্যাঁ! হ্যাঁ! তোমার কলম দাও!] আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডঃ পেরী!

মুহূর্তে কি যেন একটা হয়ে গেল! অথৈ জলের তলা থেকে কোন জলপরীর পাখা ভর করে ওপরে ভেসে উঠলে পাতালপুরীর রাজকুমারের মানসিক অবস্থা যেমন হয়, আমার মনেও তেমন হতে

লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না—যে ডঃ পেরী অনুমোদন ক'রে তাঁর নাম সই করছেন। কলমটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—Mr. Biswas, I have read your thesis line by line word by word. I can realise what a great man Thakur Anukulchandra is ! Your thesis is a great challenge to American society. Wish you success. [মিঃ বিশ্বাস তোমার থিসিসের প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ আমি পড়েছি। আমি অনুভব করতে পারছি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি এক মহান ব্যক্তি ! তোমার থিসিস আমেরিকার সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ! তোমার সাফল্য কামনা করি।] থিসিসখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, এখন মৌখিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হও। ডঃ বেলফোর্ডকে ব'লো তিনি তোমার 'ওরাল পরীক্ষার' সংবাদ দিলেই আমি আসব।

আমার চোখের পাতা দুটো ভরে উঠল জলে। কোনমতে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বল্লাম, Thank you very much Sir. [আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।] নমস্কার করে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

ডঃ জনসনের কাছে যেতেই তিনি তাঁর অনুমোদন করা থিসিসের কপি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, Mr. Biswas I have never seen a student who could finish a thesis in three months. [মিঃ বিশ্বাস ! আমি আজ পর্যন্ত একটি ছাত্রও পাই নি যে তিন মাসে থিসিস লিখে সাবমিট করতে পারে।] আমি বিনয়ের সঙ্গে বল্লাম—It is not three months Dr. Johnson. It is twenty two years three months. [এটা তিন মাস নয়। বাইশ বছর তিন মাস !]

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকালেন ডঃ জনসন। বল্লেন, How come ! Your outline had been approved on the 13th February, and today is the 25th May. [সে কেমন করে ! তোমার আউট লাইন অনুমোদন পেয়েছে ১৩ই

লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না—যে ডঃ পেরী অনুমোদন ক'রে তাঁর নাম সই করছেন। কলমটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—Mr. Biswas, I have read your thesis line by line word by word. I can realise what a great man Thakur Anukulchandra is! Your thesis is a great challenge to American society. Wish you success. [মিঃ বিশ্বাস তোমার থিসিসের প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ আমি পড়েছি। আমি অনুভব করতে পারছি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি এক মহান ব্যক্তি! তোমার থিসিস আমেরিকার সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ! তোমার সাফল্য কামনা করি।] থিসিসখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, এখন মৌখিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হও। ডঃ বেলফোর্ডকে ব'লো তিনি তোমার 'ওরাল পরীক্ষার' সংবাদ দিলেই আমি আসব।

আমার চোখের পাতা ছুটো ভরে উঠল জলে। কোনমতে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বল্লাম, Thank you very much Sir. [আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।] নমস্কার করে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

ডঃ জনসনের কাছে যেতেই তিনি তাঁর অনুমোদন করা থিসিসের কপি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, Mr. Biswas I have never seen a student who could finish a thesis in three months. [মিঃ বিশ্বাস! আমি আজ পর্যন্ত একটি ছাত্রও পাই নি যে তিন মাসে থিসিস লিখে সাবমিট করতে পারে।] আমি বিনয়ের সঙ্গে বল্লাম—It is not three months Dr. Johnson. It is twenty two years three months. [এটা তিন মাস নয়। বাইশ বছর তিন মাস!]

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকালেন ডঃ জনসন। বল্লেন, How come! Your outline had been approved on the 13th February, and today is the 25th May. [সে কেমন করে! তোমার আউট লাইন অনুমোদন পেয়েছে ১৩ই

ফেব্রুয়ারী আর আজ মাত্র ২৫শে মে।]

আমি বল্লাম—সে কথা ঠিক। তবে যাঁর ওপরে এই গবেষণা করেছি, তাঁর কাছে ১৯৪৮ সাল থেকে ছিলাম এবং গত ১২ বছর ধরে তাঁকে অধ্যয়ন করেছি আর তাঁর মতবাদ তিন মাসে লিখেছি।

ডঃ জনসন নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন আমার কথা। বল্লেন—তাও অদ্ভুত! যাহোক তুমি কৃতকার্য হও!

ফাঁড়া কেটে গেল অনেকখানি। ডঃ বেলফোর্ডের কাছে যেতেই তিনি বল্লেন, আমার অনুমোদন আছেই! তুমি বরং ওটা পুরা ক'রে ৬ কপি তৈরী ক'রে ফেল। ফাইনাল কপিতে আমার সই দেব।

আর মাত্র ৭ দিন আছে মাঝখানে। এর মধ্যে নির্ভুল টাইপ ক'রে ৬ কপি জমা দিতে হবে ইউনিভার্সিটির অফিসে।

কোন টাইপিষ্টের খোঁজ করা বৃথা। কারণ কমপক্ষে ২৫০ পৃষ্ঠা থিসিস টাইপ করতে ৫০০ ডলার (প্রায় ৪ হাজার টাকা) লেগে যাবে। তা পাব কোথায়। আর ৫০০ ডলার দিলেও এই ৭ দিনের মধ্যে কেহ ক'রে দেবে না। কারণ কেউ তো আর নিষ্কর্মা হয়ে বসে নেই যে আমার কাজ দেওয়ামাত্র করতে শুরু করে দেবে। তাই নিজেই ফাইনাল কপির টাইপিং শুরু করলাম।

প্রতিদিন ১৯ ঘণ্টা থেকে ২১ ঘণ্টা টাইপ মেসিনের ওপরে বসে। যেটুকু সময় আহারাদির জন্য না দিলে বসা যাবে না সেই সময়টুকু ছাড়া অবশিষ্ট ১৯ থেকে ২১ ঘণ্টা সময় টাইপ ক'রে চলেছি। বিকাশ প্রভৃতি ওরা তাদের কোন বন্ধুর কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক টাইপ মেসিন জোগাড় ক'রে এনে দিল। তাতে আঙ্গুলের খাটুনীটা খুবই কম।

আমাদের গুরু-ভ্রাতা রবার্ট কামিং ও তাঁর পত্নী ডেবোরা কামিং থিসিসের আদ্যপান্ত পড়ে ইংরাজী ভাষার গলদ যেখানে যা ছিল তা ঠিক করে দিলেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

কি মিষ্টি মানুষ এই রবার্ট কামিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী তাঁর মাথায়। ভারতবর্ষে এসেছিলেন—পীস কোরের (Peace

Core) মেম্বার হয়ে। আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করে দীক্ষা নিয়েছিলেন ৺সুশীল বসুদার মাধ্যমে। বিরাট লোকের একমাত্র সন্তান। বাবা প্রখ্যাত অধ্যাপক। কিন্তু বাবার কাছ থেকে এক পয়সা নেন না নিজের প্রয়োজনে। কখনও শিক্ষকতা কখনও রচনাদি লিখে যা পান তা নিয়েই সহজ সরল জীবন যাপন করেন।

৭ দিনের মধ্যে টাইপ করতে হবে ২৫০ পৃষ্ঠা। সে এক ভয়াবহ কাজ। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আর বুঝি স্ট্যাণ্ড করতে পারব না। এই টেনসন। প্রাণটা বুঝি এখনই বেরিয়ে যাবে। নারায়ণ মজুমদার মাঝে মাঝে আমার পিঠ, মাজা ও মাথাটা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। তাতে শ্রান্তির প্রকোপটা অনেকখানি লাঘব হচ্ছে। একটা করে দিন যাচ্ছে আর টেনসনের গভীরতা যেন এক হাজার ফুট বেড়ে যাচ্ছে। যে পৃষ্ঠাগুলি টাইপ হচ্ছে তাতে কোন টাইপ মিষ্টেক আছে কিনা তা নিজে দেখবার মত অবকাশ নেই। ডেভিড লিটগার্ন, নারায়ণ মজুমদার ও বাবুভাই নামে একটি যুবক পৃষ্ঠাগুলি দেখে দিচ্ছে। তাদের এই স্বতস্বেচ্ছ ও অক্লান্ত সাহায্য না পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থিসিস জমা দিতে পারতাম বলে মনে হয় না।

১লা জুন, ১৯৭২। রাত্রি সাড়ে নয়টায় রওনা হলাম ডঃ বেলফোর্ডের বাড়ীতে। সঙ্গে নারায়ণ মজুমদার! হেঁটে যাওয়া প্রচুর সময়সাপেক্ষ। তাই ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লাম তাতে। এত রাত্রে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে হাজির হওয়ায় বিস্মিত হলেন ডঃ বেলফোর্ড। নিজের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে দেখলেন আমার থিসিস। বল্লেন, আমি অ্যাপ্রুভ (অনুমোদন) করে আমার সই দিচ্ছি যাতে আগামীকাল ডেড-লাইন 'মীট' করতে পার। তারপর বিবলিওগ্রাফী ইত্যাদি যা যা বাকী আছে তা লিখে দু-চার দিনের মধ্যে আমার অফিসে জমা দিয়ে এস। আমি ব্যবস্থা করে নেব।

আনন্দ শুনে বিস্মিত হয়ে বল্ল, চেয়ারম্যানের অনুমোদন করা মানেই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি তোমার থিসিস স্বীকার করে (**accept**)

নিল। কিন্তু থিসিস পার্ফেক্টলী কমপ্লীট না হলে-চেয়ারম্যান যে অনুমোদন করেন তা এই প্রথম দেখলাম।

পরের দিন। অনেকগুলি কপি করতে হবে থিসিসের। ছয়খানা জমা দিতে হবে ইউনিভার্সিটির অফিসে—অরিজিন্যাল খানা সহ। X-rox কোম্পানীতে জমা দিলাম অরিজিন্যাল কপি। কিন্তু তারা বেলা চারটার মধ্যে কপি করে দিতে পারল না। প্রমাদ গণলাম মনে মনে। আগামীকাল তো রবিবার। সুতরাং ৪ঠা জুনের পূর্বে থিসিস জমা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এত পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত থিসিস জমা দিতে পারব না অক্টোবর কনভোকেশনের জন্য? ডঃ হাগ যদি জমা না নেন লাষ্ট ডেট্ পার হয়ে গেছে বলে!

ভাবছি—যাই তাঁর অফিসে। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলি ডঃ হাগকে। হঠাৎ দেখি ডঃ হাগ বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। খুলে বল্লাম আমার পরিস্থিতির কথা। ডঃ হাগ হেসে বল্লেন, All right Mr. Biswas. Bring your thesis to my office in the first hour on Monday. [ঠিক আছে মিঃ বিশ্বাস। সোমবার সকালের দিকে জমা দিও আমার অফিসে।]

সকাল ন-টার সময় ছ-কপি থিসিস্ ডঃ হাগের অফিসে জমা দিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। কিন্তু একি! আর যে চলতে পারছি না! মাথার উপর থেকে সাধ্যাতীত ভারী বোঝা অনেকক্ষণ থাকবার পর পড়ে গেলে মাথার মধ্যে যেমন লাগে ঠিক তেমন মনে হতে লাগল। সারা শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে। পা-টলছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি পড়ে যাব পথের ওপরে। অজ্ঞান হয়ে যাব ব'লে মনে হচ্ছে। কি এক ঘন অন্ধকার আমায় যেন গ্রাস করতে আসছে বলে মনে হচ্ছে। নিজেকে অতিকষ্টে সামলিয়ে নিয়ে হাজির হলাম অ্যাপার্টমেন্টে। "আমায় ডেকোনা" ব'লে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। আর কোন হুঁস্ নাই। নিদ্রার অতল তলে ডুবে পড়েছিলাম বলে জানাল সবাই। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন শুনলাম মঙ্গলবার সকাল দশটা!

ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটলে রোগীর যে অবস্থা হয়—শরীরের কাটা-ছেঁড়ার যন্ত্রণা বেশী করে বোধ করতে শুরু করে—আমারও ঠিক সেই অবস্থা। থিসিস্ সাবমিট করার নেশা আমায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিল, সমগ্র সত্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে জীবনের আর কোন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন বোধই ছিল না। আজ ঘুম থেকে উঠতেই সেই বোধগুলি যেন চেতন মনের ওপরে আছড়ে পড়তে লাগল।

বিকাশ তার বন্ধুদের কাছে চলে গেছে। আলোক ও নারায়ণ কোন একটি কোম্পানীতে দারোয়ানোর কাজ পেয়েছে। কখনও সারাদিন কখনও বা সারারাত্রি ডিউটি দিতে হয়। আমি একা ঘরে বসে। হাত-পা অসাড়। মন কেমন শূন্য। মাঝে মাঝে বাড়ীর জন্য মন কেমন ক'রে উঠছে। ভালবাসা ও স্নেহের যারা তাদেরকে বুকের মাঝে পাবার জন্য হাহাকার করে ওঠে ক্ষুধার্ত সত্তা। কিন্তু যাব কি ক'রে? প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া "ভাইভ্যাভোসি" (মৌখিক পরীক্ষা) না হওয়া পর্যন্ত তো যাবার উপায় নাই। ভাই-ভ্যাভোসি হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। এই তিন মাস নিজের আহারের সংস্থানই বা করব কি করে?

চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। যেখানে যাই সেখানেই "নো ভ্যাকেন্সী।" স্কুল, লাইব্রেরী, সুপার মার্কেট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, অফিস, নানা এজেন্সী—সব ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম। এদেশে "সামারের" সম্ভাব্য সমস্ত চাকরি রিজার্ভ থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাদের সুযোগ দেবার পর অন্যের প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী যারা ফুল-টাইম পড়াশুনা করে তারা এই সময় ফুলটাইম কাজ ক'রে মোটা টাকা কামাই করে রাখে! আমিও তো ছাত্র। ফুলটাইম চাকরি করার অনুমতিপত্রও আছে আমার। কিন্তু আমি তো মে মাসে দরখাস্ত করে রাখিনি কোথাও। তাই চাকরি আমার ভাগ্যে জুটলো না।

খাব কি? নিজের কাছে যা ছিল তা ভাঙ্গিয়ে চলেছে এই

তিন মাস। ডেভিড ও গিজেলা অযাচিতভাবে সাহায্য করেছে কখন কখনও।

আমার সঙ্গে কাজ করত একটি আফ্রিকান যুবক। সে দীক্ষাও নিয়েছিল আমার মাধ্যমে। এম. এ পড়ত নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে একদিন আমার অ্যাপার্টমেণ্টে এসে হাজির। বলিষ্ঠ দেহ। মুখ-কান্তি সুন্দর—মনে হয় পাথরে খোদাই করা নাক-চোখ-মুখ। ব্যবহারটিও বড় মিষ্টি। হ্যালো বলে আমার হাত চেপে ধরল। বিশ ডলারের একখানা নোট আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বল্ল—আমি জানতাম না যে তুমি লেখার কাজে খুবই ব্যস্ত আছ। তোমার ভরণপোষণ প্রয়োজন। অনুগ্রহ ক'রে এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ কর। তার কাছে ক্ষুদ্র হলেও আমার কাছে অনেক দাম ঐ বিশ ডলারের।

হয়রান হয়ে পড়লাম চাকরির খোঁজ করতে করতে। হয়রান হয়ে ফিরছি সেদিন। সেভেন্থ স্ট্রীটের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল—Knat. (ন্যাট) সুদর্শন যুবক। চুল কাটে খুব সুন্দর। বছরখানেক আগে একবার চুল কেটেছিলাম তার সেলুনে। কিছুতেই পারিশ্রমিক নিল না আমার কাছ থেকে। বলেছিল—You are our guest—far away from your country. How can I take money from you? [তুমি আমাদের দেশে অতিথি—স্বদেশ থেকে বহুদূরে আছ। তোমার কাছ থেকে পয়সা নেব কি করে?] পয়সা নেয়নি বলে আর কোনদিন চুলকাটতে যাইনি তার সেলুনে। তবে দেখা ও গল্প হতো প্রায়ই। একই রাস্তার ওপরে আমাদের অ্যাপার্টমেণ্ট। আমাদের নাম্বার ৩২ ওর নাম্বার ৪০ কি ৪২। মাঝে মাঝে মটরের ডালের স্যুপ রান্না করে Knat-কে দিয়ে যেতাম খাবার জন্য। খুব পছন্দ করত আমার রান্না ভারতীয় স্যুপ।

আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্ল—তোমার চুল খুবই বড় হয়েছে। কাটানো দরকার। ভিতরে এস। আমায় চেয়ারে বসিয়ে চুল কাটতে শুরু করে দিল।

এদেশে একদিনের চুলকাটার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তেই

হাসি পেল। এখানে বিভিন্ন সেলুনে বিভিন্ন ধরনের চুলকাটা হয়, তাই পারিশ্রমিকও এক নয়। একটা সেলুনের পারিশ্রমিক হচ্ছে ১ ডলার ২৫ সেন্ট। সস্তা ভেবে ঢুকেছিলাম সেখানে। কাঁচি কি বস্তু তা চোখে দেখলাম না। ইলেকট্রিক মেশিন মাথায় দু-চারবার ঠেকিয়েই ব্রাস করে দিয়ে বল্ল O. K. (ঠিক আছে)। আয়নায় চেয়ে দেখি—মাথাটা আমার ঘাড়ে ঠিকই আছে বটে, তবে হাতে একখানা লাঠি নিয়ে এক্কাগাড়ী চালালে ভারতের এক্কাগাড়ীর (টাঙ্গাও বলে) গাড়োয়ানরাও না হেসে পারত না।

আর একবার একটা সেলুনে চুল কাটছি। আমার সামনেই দেয়ালে টাঙানো বোর্ডে লেখা আছে **Hair cut 2 Dollars.** [চুলকাটা দুই ডলার] যে চুল কাটছে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—যদি দাড়ি কামাই তবে আমায় কত দিতে হবে? সে একগাল হেসে বল্ল—আড়াই ডলার।

আমি বল্লাম—**O. K. Shave too.** [ঠিক আছে। দাড়িও কামাও]।

চুল-দাড়ি কাটা হয়েছে। আমার ওভারকোটটা চাপিয়ে দিয়ে পকেট থেকে আড়াই ডলার বের করে "বারবারের" হাতে দিলাম। সে আবার একগাল হেসে বল্ল—**Another two dollar, please.** [আরও দুই ডলার দাও]।

আমি তো অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি আরও দুই ডলার চায় কেন?

আমি যে বুঝতে পারিনি তা "বারবার" বুঝতে পেরেছে! বল্ল—**Two dollars for haircut and two and half dollars for shaving.** [চুলকাটা দুই ডলার আর দাড়ি কামানোর জন্য আড়াই ডলার]।

ডাকাত! একি গলাকাটার দেশ নাকি! বাজনার চাইতে বাজনা বেশী? চুল কাটতে দুই ডলার আর দাড়ি কামাতে তারও বেশী! এই সাড়ে চার ডলার মানে প্রায় ৩৬ টাকা। ৩৬ টাকা হলে ভারতে চারটে পাকা রুই মাছের মাথা পাওয়া যেত!

পকেট হাতড়িয়ে বল্লাম—আমি দুঃখিত। আমার পকেটে কিছুই নাই। যদি কিছু মনে না কর তবে আগামীকাল তোমাকে দিয়ে যাব। লোকটা নিতান্ত ভদ্র বলেই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিল। বলা বাহুল্য, পরের দিন বাকী দুই ডলার দিয়ে এলাম। আর মনে মনে স্থির করলাম আর কোনদিন আমেরিকার সেলুনে দাড়ি কামাব না।

কথা প্রসঙ্গে Knatকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার জানাচেনা কোন জায়গায় ভ্যাকেন্সি আছে কিনা! Knat বল্ল—এই ঠিকানা নাও! আমি জানি এদের লোকের প্রয়োজন। তুমি বরং এক্ষুণি যাও। আমার কথা উল্লেখ করো।

থার্ড অ্যাভিনিউ ও সিকস্থ স্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে একটা ডেলিকেটেসেন্সে হাজির হলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে Knat-এর রেফারেন্স দিলাম। ম্যানেজার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আজ থেকেই কাজ করতে রাজী আছি কিনা! রাজী আছি বলতেই ভদ্রলোক বল্লেন—O. K. man, go and come back by 1 O'clock with your shoe on. [ঠিক আছে। এখন যাও, বেলা একটার মধ্যে চলে এস। জুতা পরে এস।] আমার পায়ে ছিল জাপানী হাওয়াই চপ্পল। তাই 'সু' পরে আসবার কথা বল্লেন ভদ্রলোক। আবার মজুরী হবে ঘন্টায় দুই ডলার—তাও জানাতে ভুল্লেন না।

দ্রুতপদে বাসায় ফিরে এসেই খিসিস-কারী চাপিয়ে দিলাম গ্যাস-ষ্টোভে। সিদ্ধ হবার পূর্বেই স্নানাদি সেরে নিলাম। খাওয়ার ইচ্ছাটা অনেকখানি দমিত। মনে হয় আনন্দের চাপা আবেগই তার জন্য দায়ী। প্রয়োজনক্লিষ্ট বেকার জীবনে চাকরির স্বাদ যে কেমন, তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। একটু খিসিস-কারী মুখে দিয়ে তৈরী হলাম স্যুট-টাই পরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে এক ডলার প্রণামী-অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রার্থনা করলাম—দয়াল, চাকরি করতে যাচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

যথাসময়ে হাজির হলাম সেই দোকানে। ভদ্রলোক অফিসিয়াল ফর্মালিটিস্‌গুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞাসা করছেন—ডু ইউ ফলো? নিজে স্প্যানিয়। তার গায়ের রঙ ও আকারের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় আমাকেও স্বজাতি বলে ভুল করেছিলেন। অ্যাটেণ্ডেন্স্ কার্ড কিভাবে পাঞ্চ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। সর্বশেষে একটা অ্যাপ্রন আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—Let us go to the other room [চল পাশের ঘরে যাই।]

অ্যাপ্রনটা হাতে নিয়ে ভাবছি এটা দিয়ে কি করব রে বাবা! রান্নাঘরের মত একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন—Your duty is to cut fish into pieces. (তোমার কাজ হচ্ছে মাছ কেটে টুকরো করা)

সর্বনাশ! ঘরে ঢোকামাত্র মাছের গন্ধ ঢুকে গেছে পাকস্থলীতে। মনে হচ্ছে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে এখনি। পৈটিক জগতের সবকিছুই পাক্ খেতে শুরু করেছে ঐ গন্ধের আক্রমণে। মনে হচ্ছে বমি করে ফেলব।

নাক চেপে ধরে বহু কষ্টে জিজ্ঞাসা করলাম—Don't you have any other job? [তোমাদের আর কোন কাজ নাই?] ভদ্রলোক বল্লেন—We are sorry. We donot have any oth:r vacancy except this fish cutting. [এই মাছ কাটবার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ খালি নেই] বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম—গোলি মারো তোমার ফিস্‌কাটিং!

ভদ্রলোক আমার মুখের কাছে তার লাল নাকটা এগিয়ে এনে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—গোলি মারো! গোলি মারো মিনস্? আমি হেসে বল্লাম—গোলি মারো means intolerable, repugnant smell. [গোলি মারো মানে অসহ্য পূতি গন্ধ]। —Oh, no, no, no bad smell at all [না না! কোন দুর্গন্ধ

নেই] এই বলে এক বিরাট সামুদ্রিক মাছের চাঁই আমার নাকের কাছে তুলে ধরল।

এই চাঁইতে গন্ধ নাই ঠিকই। কিন্তু ঘরের ভেতরে তাজা মরা, পচা, বরফদেওয়া নানা প্রকারের মাছ। কোন্‌টা থেকে এই প্রাণঘাতী গন্ধ আসছে তা কে জানে? বল্লাম, মাপ করো, এখানে আমার কোন চাকরির প্রয়োজন নেই। তোমাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।

অ্যাপ্রনটা ভদ্রলোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। মুখ দিয়ে থুথু বেরিয়ে আসছে অনবরত। পেট পাকাতে লাগল। বার বার বমির ভাব আসছে। বাসায় ফিরে মুখ নাক বার বার ধুয়ে নানা ধরনের সেন্ট নাকে ঘসতে লাগলাম। প্রায় এক ঘন্টা লাগল এই দুর্গন্ধের দুর্বিপাক থেকে সুস্থ হতে।

দুর্গন্ধ দূরীভূত হলেও দুশ্চিন্তার বোঝা তো মাথায় চেপে বসে রইল—চাকরি পাব কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের নোটিশ বোর্ডে একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম—**A store-clerk is required.** তক্ষুণি ট্রেন ধরে চলে গেলাম সেখানে। বাংলা ভাষার **store clerk** প্রতিশব্দের দ্বারা যা বোঝায় তার সঙ্গে যে কাজ পেলাম তার কোন মিল নেই। বৃটিশ ইংলিশের কোন কোন শব্দের অর্থ আমেরিকার ব্যবহারিক ইংলিশে যে আলাদা, তার দু-চারটা নমুনা জানা ছিল। তবে **store-clerk** মানে যে "মালবাবু না হয়ে মালটানা বা ট্রাক বোঝাই করা মজুর বোঝায় তা জানা ছিল না।

যথাস্থানে হাজির হতেই ভদ্রলোক আমাকে মৌখিক অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দিলেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—**Do you know driving?** [তুমি কি গাড়ী চালাতে পার?]

আমি না বলতেই বল্লেন—**O. K. get in.** [ঠিক আছে, উঠে পড়], সামনে দণ্ডায়মান মিনি ট্রাকে উঠতে ইঙ্গিতে করলেন। আমায় নিয়ে এলেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক স্থানে। বারো-তলে অবস্থিত কোন এক কোম্পানীর ষ্টোর থেকে টেলিফোন-সেটপূর্ণ ছোট বাক্স ঠেলায় করে নিচে নামিয়ে এনে ট্রাক বোঝাই করলাম। ফিরে এলাম ভদ্র-

লোকের স্টোরে। ভদ্রলোক তো ট্রাকের পেছনটা গুদামের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজে ঘুরে বসলেন একটা রিভল্‌ভিং চেয়ারে। এখন গোটা ট্রাক মাল নামাতে হবে আমাকে। ঘাড়ে করে টেনে নিয়ে স।।জিয়েও রাখতে হবে গুদামে। একবার একটা বাক্স বোঝার ওপর থেকে নিচে ধপ করে পড়তেই ভদ্রলোক গর্জন করে উঠলেন তার টেব্‌ল থেকে—don't break (ভেঙ্গ না)। ভদ্রলোকের বোধ হয় খেয়াল ছিল না যে তিনি কোকোকোলা পান করছিলেন। হঠাৎ গর্জন করতেই ফোয়ারার ঝলকের মত একঝাঁক কোকোকোলা মুখ থেকে বেরিয়ে মুক্তির স্বাদ পেল। আমার মুক্তি কখন হবে কে জানে ? মনে পড়ে গেল আমার আলফা কেমিক্যালে কাজ করত যে জানকী তার কথা। মালিকের ব্যবহার কেমন হলে কঠোর পরিশ্রম করেও শ্রমিক তার সত্তার পুষ্টি আহরণ করতে পারে ও মালিকের স্বার্থকে আপন স্বার্থ বলে বোধ করতে পারে তার একটা মর্মস্পর্শী অনুভূতি জেগে উঠল ভেতরে।

দুই ঘণ্টার কম সময়েই কাজ শেষ হল। আবার দুই ঘণ্টার প্রাপ্য ৬ ডলার (প্রায় ৪৮ টাকা)। ভদ্রলোক আমার হাতে ৯ ডলার দিলেন। তিন ডলার যে টিপস্ (বকশিস) দিলেন তা বুঝতে পারলাম। তবে তার সঙ্গে বিদায়ও যে দিলেন আমাকে তাও বুঝতে পারলাম যখন বল্লেন—ঠিক আছে মিঃ বিশ্বাস, যদি এবং যখন দরকার পড়বে তখন খবর দেব। ক্লান্ত দেহে ফিরে এলাম অ্যাপার্টমেন্টে।

দৈহিক ক্লান্তির সঙ্গে মানসিক শ্রান্তিও বেড়ে চল্ল ক্রমশ। প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাবার জন্য হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। সন্তান বাৎসল্যে ভরপুর অন্তর উন্মুখ হয়ে উঠল সন্তানদের বুকের মাঝে পাবার জন্য। প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল আমার অন্তর-জগৎ যেন শুকিয়ে গেছে। স্নেহ-ভালবাসার কোন রস তাতে নাই। এই দু'বছরে স্নেহ-ভালবাসা বা আদর সোহাগের অভিব্যক্তি প্রকাশের একটি ক্ষেত্রও পাইনি বল্লে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া বিবেকের সঙ্গে লড়াইও করতে হয়েছে অনেকদিন। কত ছেলে ও

মেয়ে আমাকে diseased (রোগগ্রস্ত) বলে মন্তব্য করেছে। তাদের বিবেচনায় স্ত্রীকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে রেখে কোন স্বামীর পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা abnormality (অস্বাভাবিকতা) ব diseased (রোগগ্রস্ততার) এর লক্ষণ।

উপায়-অন্তর না দেখে দেখা করলাম ডীন ডঃ পেইন এর সঙ্গে। ডঃ পেইন হচ্ছেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস ডীন। তাঁকে বল্লাম আমার পরিস্থিতির কথা। খুব সহানুভূতির সঙ্গে ডীন পেইন বল্লেন—কেরাণীর চাকরি আমার হাত নাই। প্রফেসার বা লেকচারারের পদে নিযুক্তির দায়িত্ব আমার এক্তিয়ারে। তুমি তো ডিগ্রী এখনও পাও নি। দেখি আমার অফিসে তোমায় কোন কাজ দিতে পারি কিনা! যাহোক, একটা কাজ করতে পারি—তোমার মৌখিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরের শেষে হবার কথা। সেই তারিখটাকে এগিয়ে এনে দিতে পারি। তুমি মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারবে। এখানে উপবাসে থাকতে হবে না। আমি তাতেই রাজী হলাম।

ভদ্রলোকের যে কথা সেই কাজ। সাতদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি পেলাম যে আমার মৌখিক পরীক্ষা (vivavocy) হবে আগামী ২০শে জুলাই বেলা ২টার সময়। আনন্দ শুনে বল্ল—তোমার সবকিছুই যে ভৌতিক ব্যাপার রেবতী। পরীক্ষার ডেট্ পর্যন্ত তোমার জন্য দুই মাস এগিয়ে এল! এ কোন্ সে যাদু, যে নেচার তোমাকে ফেবার করেই চলেছে?

সত্যই প্রকৃতি আমায় অনুগ্রহ করে চলেছে! তা নাহলে শেষ ধাপের আগের ধাপে আবার হোঁচট খেয়ে পড়তে হত আমাকে।

প্রত্যেক ডক্টোরাল ছাত্র-ছাত্রীকেই তার মাতৃভাষা নয় এমন যে কোন দুইটি আন্তর্জাতিক ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে নির্দিষ্ট মানের পারদর্শিতা দেখাতে হবেই। যাদের মাতৃভাষা ইংলিশ নয় তারা ইংরাজীকে একটা ভাষা হিসাবে নিতে পারে। আর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে নিতে পারে ল্যাটিন, ফ্রেন্স, জার্মানী, স্প্যানিশ প্রভৃতির যে

কোন একটি যদি তা তাদের মাতৃভাষা না হয়।

ইংরাজী আমার মাতৃভাষা নয়। তাই ইংরাজী ভাষার পরীক্ষা দিলেই আমার চলবে। তবে ফ্রেন্স, জার্মান ল্যাটিন, স্প্যানিশ— প্রভৃতির যে কোন একটা ভাষায় পাশ করতে হবে। এতো এক দুরূহ সমস্যা। এ ভাষা পড়তে গেলে অনেক সময়ও লাগবে। তাছাড়া ডলারের অঙ্ক যা, তাতে পড়ার চেষ্টা করাও এখন ধৈর্যের বাইরে।

মাথায় একটি চমৎকার কৌশল খেলে গেল। অবশ্য আনন্দের কৃতিত্বই এর মূলে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালাম যে আমি বাঙ্গালী। বাংলা আমার মাতৃভাষা। সুতরাং আমি ইংরাজী ভাষাকে একটি ভাষা হিসাবে নিতে পারি। আর হিন্দী আমার জাতীয় ভাষা (national language)। পঁয়ষট্টি কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। সুতরাং হিন্দীকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান ক'রে আমাকে "হিন্দী" দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে নিয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানিয়ে বল্লেন—হিন্দী আন্তর্জাতিক ভাষা নয়। সুতরাং ভাষা-পরীক্ষার বিষয় হিসাবে হিন্দীকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কেমন করে ?

আমিও নাছোড়বান্দা। আমি বললাম—আন্তর্জাতিক ভাষার লক্ষণ কি কি ? জনসংখ্যা—যারা ঐ ভাষায় কথা বলে ? সাহিত্য-সম্ভার ? না তোমাদের মনগড়া কোন বৈশিষ্ট্য আছে যা না হলে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে মর্যাদা পাবে না ? যে-কোন একটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে ৬৫ কোটি জনগণের রাষ্ট্রভাষার আসন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে গণ্য ল্যাটিন, ফ্রেন্স, স্প্যানিশ, জার্মান—যে কোন ভাষার আগেই হওয়া উচিত। সুতরাং আমি "হিন্দী" ভাষাতেই পরীক্ষা দেব।

এই বিভাগের অধ্যাপক আমায় বললেন—কিন্তু আমরা তোমার প্রশ্নপত্র তৈরী করব কি করে। তুমি বরং এক কাজ কর। কয়েক-খানা হিন্দী বই জোগাড় কর। প্রায় ৬০ পৃষ্ঠা মত কপি করে

আমার কাছে জমা দাও। আর কোন ভারতীয় পাও কিনা দেখ যিনি তোমার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী করে দেবেন ও খাতা দেখে দেবেন।

এ যেন পুতুল খেলা। লাইব্রেরী থেকে তুলসীদাসের জীবনী, তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, রামচরিত প্রভৃতি চার পাঁচখানা হিন্দী বই এনে প্রত্যেক বই থেকে ১০।১৫ পৃষ্ঠা হিসাবে মোট ৬০ পৃষ্ঠা X-rox মেসিনে কপি করে অধ্যাপকের হাতে দিয়ে এলাম। কোন ভারতীয় অধ্যাপকের সন্ধান আমি করি নাই! পরে শুনলাম আনন্দকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল প্রশ্নপত্র তৈরী করা ও খাতা দেখবার জন্য।

ভাষা পরীক্ষার মত কঠিন সমস্যার সমাধান যে এত সহজে হবে তা আনন্দও ভাবতে পারেনি। ভবিষ্যতে আর কোন ভারতীয় ছাত্র যদি ইউ. এস. এ-র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধির জন্য চেষ্টা করে তবে তাকে আর আনকোরা কোন ভাষা শিক্ষার জন্য পয়সা ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।

এখন ভাবতে আনন্দ হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কত উদার মনোভাবসম্পন্ন (openminded) ও আইনের মারপ্যাচের উর্ধ্বে। আইনের ব্যতিক্রম মানবার মত নমনীয়তা (flexibility) অধ্যাপকদেরকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে আমার কাছে।

২০শে জুলাই ১৯৭২ সাল। যথাসময়ে হাজির হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। মহাভারতে পড়েছি বীর অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করেছিলেন অপূর্ব রণকৌশলে। কিন্তু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত সেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি তিনি।

এক বৎসর চারমাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দ্বারের পর দ্বার অতিক্রম করে আজ প্রবেশ করলাম ভাইভ্যাভোসি রূপ চক্রব্যূহে। রুদ্ধদ্বার কক্ষ। বিরাট টেবিলের একপ্রান্তে একখানা চেয়ার আমার জন্য নির্দিষ্ট। বাকী তিনদিকে বসেছেন পাঁচজন বিশিষ্ট অধ্যাপক যাদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

সাধারণ নিয়মানুসারে এই পরীক্ষকদের তিনজন হবেন আমার যাঁর গাইড, তাঁরা। আর বাকী দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত করবেন—থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার-দক্ষতাসম্পন্ন বাস্ত্র অধ্যাপক দেখে।

আমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হল। ডঃ জনসন হঠাৎ ভারতবর্ষে গেছেন—একদল ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে—এডুকেশনাল ট্যুরে। তাঁর বদলে আর একজন অধ্যাপক এসেছেন। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁর নামটা স্মরণ করতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয় যে দু'জন অধ্যাপককে নির্বাচিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন Dr. Payne ও Dr. Hug. এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন Dr. Lee A. Belford, Dr. Robert Perryতো আছেনই।

বেলা ঠিক দু'টোর সময় ক্রসএক্সামিনেশন শুরু হল। যাঁরা আমার পরীক্ষক তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এতে আমার সুবিধার চাইতে অসুবিধা বা বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। যাঁর মতবাদের ওপরে গবেষণা করেছি তাঁর সম্বন্ধে এঁরা যদি জানতেন তবে নানা জটিল প্রশ্ন করে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করতে পারতেন। তাতে আমার কোনই অসুবিধা হতো না। কিন্তু সেপথ তাঁদের সামনে খোলা নেই। তাই ঐ লাইনে কোন প্রশ্নই করতে পারলেন না। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে। তাই থিসিসের টেকনিকের ওপরে নানা জটিল প্রশ্ন শুরু করলেন।

আমি মনে মনে শুধু "নাম" করছি। প্রশ্নবাণ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে আমার ওপরে। "নাম" রূপ বর্ম যে তাকে প্রতিহত করছে তা বেশ বুঝতে পারছি। কারণ টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্বন্ধে গর্ব করার মত আমার কিছু ছিল না। ডঃ পেইন একবার এমন একটা প্রশ্ন করলেন যে তার জবাব দিতে যেয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লাম। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথ দেখছি না। হঠাৎ আমার এক ভারতীয় বান্ধবীর কথা মনে পড়ে গেল। মিস্ অনিমা চ্যাটার্জী তাঁর নাম তিনিও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্কলারশিপ নিয়ে গত বছর ধরে গবেষণা করেছেন ক্যানসার রোগের ওপরে। ক্যানসার হেরেডিটারী কিনা তাই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই মিস্ চ্যাটার্জী আমায় বলেছিলেনে—উত্তর যা দেবেন, জোরের সঙ্গে দেবেন। আমতা-আমতা করবেন না। ভুলই বলুন আর শুদ্ধই বলুন—যাই বলবেন তা with conviction (প্রত্যয়ের সঙ্গে) বল্‌বেন। আমার জবাবটা ভুল জেনেও খুব জোরের সঙ্গে বলায় ডঃ পেইন চুপ করে গেলেন।

আর একটা টেকনিক শিখিয়ে দিলেন আমার অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন—Try to kill the time any way. [কোনমতে সময়টা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।]

প্রশ্নের ধারার পরিবর্তন হল। ডঃ হাগ প্রশ্ন করলেন—Do you think your Thaknr is Christ? [তুমি কি মনে কর যে তোমার ঠাকুর যীশু খ্রীষ্ট?]

কঠিন প্রশ্ন! শাঁখের করাতের মত। হ্যাঁ বল্লেও বিপদ। না বল্লেও প্রমাণ করতে হবে তখনই, অর্থাৎ এভিডেন্স দেখাতে হবে। দয়াল ঠাকুর নিজেই যেন উত্তর জোগান দিচ্ছেন আমার ভেতর থেকে। বল্লাম—In order to answer this question on requires a deep spiritual realization. I don't think I have such a spiritual realization. But as a research scholar I have studied twenty two thousand pages of Thakur's literature. I have seen there that Thakur has fulfiled Christ in thousand ways. [এই প্রশ্নের জবাব দিতে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয় না যে আমি অতখানি গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন। তবে গবেষক হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্যের বাইশ হাজার পৃষ্ঠা আমি পড়েছি। তাতে দেখেছি যে ঠাকুর সহস্রভাবে ক্রাইষ্টকে পরিপূরণ করেছেন।]

ঠাকুরই যে যীশুখ্রীষ্ট হয়ে এসেছিলেন তা বল্লাম। তবে নাক

ঘুরিয়ে দেখালাম। খ্রিস্টান জগতের বিশ্বাস যে একমাত্র ক্রাইস্টই পারেন যীশাস ক্রাইষ্টকে পরিপূরণ করতে। আমি বল্লাম—শ্রীশ্রীঠাকুর যীশাস ক্রাইষ্টকে পরিপূরণ করেছেন।

ডঃ পেরী প্রশ্ন করলেন—You love your Thakur. Is it not? [তুমি তোমার ঠাকুরকে ভালবাস, তাই না?]

আমি—Yes. (হ্যাঁ।)

ডঃ পেরী—Do you think that your children will love him. [তুমি কি মনে কর যে তোমার সন্তান-সন্ততিরা ঠাকুরকে ভালবাসবে?]

আমি—I think my chidren will love Thakur more than I love him. [আমি মনে করি আমার ছেলে-মেয়েরা আমার চাইতেও বেশী ভালবাসবে ঠাকুরকে।]

ডঃ হাগ—What's about your grand children? [তোমার নাতি-পুতি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?]

আমি—That I can't tell you now.

[তা আমি এখন বলতে পারি না]

ডঃ হাগ—Do you think, when people will be deviated from the path propounded by Thakur, Thakur will come again? [তুমি কি মনে কর যে লোক যখন ঠাকুরের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, ঠাকুর তখন আবার আসবেন?]

এই প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে দিলাম। প্রভু যীশু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হজরত রসুল ও ভগবান শ্রীচৈতন্য এ সম্বন্ধে কি বলেছেন তা উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থার একটা বাণী বল্লাম। ঠাকুর বলেছেন—I shall come again. [আমি আবার আসব।]

ডঃ পেরী সমর্থন জানিয়ে বল্লেন—Yes; history says so. [হ্যাঁঃ ইতিহাস তাই বলে।]

ডঃ হাগ—How will you account for that Sri Sri Thakur had a profound knowledge about all the

aspect of life ! Did he really know everything ? [তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের সমস্ত বিষয়ে এত গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি কি সত্যই বাস্তবে সব জানতেন ?]

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা তাঁদের সামনে তুলে ধরলাম। বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়ে বল্লাম—আমি ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে একটা মানুষের পক্ষে জীবনের সমস্ত বিষয় জানা কিভাবে সম্ভব ? ঠাকুর তার উত্তরে বলেছিলেন—**If you know one, you can know all.** [তুমি যদি এক-কে জান, তবে সব জানতে পারবে।]

আমার উত্তর শুনে ডঃ হাগ চোখদুটো বড় বড় করে বললেন—**Well, I know one, I don't know all.** [আমি তো এক-কে জানি কিন্তু কৈ আমি তো সব জানি না।]

ডঃ পেইন হেসে বললেন—**Thakur knows one means he knows God.** [ঠাকুর এক-কে জানেন মানে তিনি ঈশ্বরকে জানেন।]

ডঃ হাগ—**Of course, I don't know God.**

[অবশ্য আমি ঈশ্বরকে জানি না।]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা যখন বর্ণনা করছি, অধ্যাপকগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে শ্রদ্ধাপ্লুত বিস্ময়ের ছাপ। সময় কেটে গেল অজ্ঞাতে। চারটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। ডঃ পেইন আমায় বল্লেন—**O. K. Mr. Biswas. You are a very clever man. You have made your statements so cleverly that we could not trap you.** [ঠিক আছে মিঃ বিশ্বাস। তুমি খুব চালাক লোক। তোমার বিবৃতিগুলি এমন চতুরভাবে করেছ যে আমরা তোমায় ফাঁদে ফেলতে পারলাম না।]

এই ফাঁদে ফেলার অর্থ পরের দিন বুঝেছিলাম একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে। এঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—আমি যে ঠাকুর সম্বন্ধে

biast (ধারণাভিভূত) তাই প্রমাণ করতে। আমাকে ঠাকুর সম্বন্ধে biast (ধারণাভিভূত) প্রমাণ করতে পারলেই আমার গোটা থিসিস নাকোচ হয়ে যেত। ডিগ্রী আর কপালে জুটতো না এ যাত্রায়। কারণ কারও সম্বন্ধে অভিভূতি থাকলে তাঁর সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য মত প্রকাশ করা যায় না।

ডঃ বেলফোর্ড বল্লেন—মিঃ বিশ্বাস তুমি এখন বাইরে যাও ও একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পান কর। এখানে এখন ভোট হবে।

"Thank you" [ধন্যবাদ বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। ড্রিংকিং প্যানের পুশ-বটম্-এ চাপ দিয়ে একটু আইস-কোল্ড ওয়াটার [হিমশীতল জল] মুখে দিলাম বটে, তবে সে জলটুকু বুকের নিচে পর্যন্ত গেল বলে মনে হল না। বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডের (heart) যে লেফ্ট-রাইট শুরু হয়েছে তা ডাক্তার দেখলে তখনই হৃদরোগের রোগী বলে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। কাঠগড়া থেকে নেমে এসে খুনের আসামী "ফাঁসীর হুকুম অথবা বেকসুর খালাস" এই রায় শুনবার জন্য যে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে উদাস নয়নে চেয়ে থাকে, আমার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। প্রাণপণে নাম করছি আর স্বগত কেঁদে কেঁদে বলছি—দয়াল তোমার ইচ্ছা। এত আবেগ ভরে নাম জীবনে আর কোনদিন করেছি বলে মনে পড়ে না।

নাম করছি আর হাতঘড়িতে সময় দেখছি। এক মিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট পার হয়ে গেল। কি হবে কে জানে! ভোটে যদি সর্বসম্মতিক্রমে আমার অনুকূলে ঐক্যমত হয় তাহলে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই দরজা (ঘরের সম্মুখ দরজা) খুলে যাবে। পরীক্ষকগণ একে একে বেরিয়ে আসবেন ও আমায় করমর্দন ক'রে "ডঃ বিশ্বাস" বলে সম্বোধন করবেন। আর একমত যদি তাঁরা না হন তাহলে এ দরজা খোলা হবে না। ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পরীক্ষকগণ বেরিয়ে যাবেন। কোন "বেয়ারা" এসে আমায় জানাবে—তুমি এখন বাড়ী যেতে পার। সময়মত তোমাকে জানানো হবে।

তাই গভীর উৎকণ্ঠায় কান পেতে শুনবার চেষ্টা করছি পেছনের দরজা খুলে অধ্যাপকগণ বেরিয়ে গেলেন কি না!

চার মিনিট পাঁচ মিনিট! সব যেন অন্ধকার মনে হচ্ছে! ঘরগুলি ঘুরছে। কোল্ড ওয়াটারের প্যানটা ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে। বুকের ভেতরে হৃদ্‌পিণ্ডের হঠকারিতা বুঝি আর চেপে রাখা যাবে না। এখনই বুকের পাঁজরগুলি ভেঙে-চুরে বেরিয়ে আসবে বাইরে। নাম চলছে ঝড়ের গতিতে। সাড়ে পাঁচ মিনিট পার হল। দেখছি মিনিটের কাঁটাটা আরও চলছে কিনা। হঠাৎ আমার সামনের দরজা খুলে গেল—নিঃশব্দে. পরীক্ষক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ লীঃ এ. বেলফোর্ড বেরিয়ে এলেন। আমার ডান হাত চেপে ধরে দুটো ঝাঁকি দিয়ে বল্লেন—"Congratulation Dr. Biswas (ডঃ বিশ্বাস অভিনন্দন)। চেয়ারম্যান কর্তৃক "Dr. Biswas" বলে সম্বোধিত হওয়া মানেই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মিঃ বিশ্বাসকে "ডক্টরেট" উপাধিতে ভূষিত করলেন। ভাবের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লাম ডঃ বেলফোর্ডকে—অমি কি আপনাকে ভারতীয় প্রথায় আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারি?

ডঃ বেলফোর্ড "yes" বলতেই হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকালাম তাঁর পায়ের কাছে। ঠিক সন্তান বা শিষ্য. পিতা বা গুরুকে যেভাবে প্রণাম করে তেমনই ভাবে প্রণাম করলাম ডঃ বেলফোর্ডকে। ডঃ বেলফোর্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখদু'টি ভরে উঠেছে আনন্দাশ্রুতে।—ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের বাৎসল্য যে সন্তান বাৎসল্যের মতই প্রাণস্পর্শী তা হৃদয়ঙ্গম করলাম ডঃ বেলফোর্ডের চোখে।

পর পর ডঃ পেইন, ডঃ পেরী ডঃ হাগ প্রভৃতি সকলে একই প্রথায় আমায় করমর্দন ক'রে বল্লেন—"Congratulation Doctor" ডঃ হাগ আমার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্লেন—You have made it at last, Dr. Biswas. [শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিলে ডঃ বিশ্বাস।]

অধ্যাপকগণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন চোখের আড়ালে। একঝাঁক

ছেলেমেয়ে (সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মচারী) ছুটে এসে আমায় অভিনন্দন জানাল।

তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে এলাম লিফটের দিকে। লিফট তখন গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। নিচে নামাবার 'ইণ্ডিকেটর বোতামটা টিপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি লিফটের সামনে। বিরাট এক অঙ্কের আদ্যান্ত-দৃশ্য ভেসে উঠল আমার চোখের সম্মুখে।

ইং ১৯৬৩ সলে। পরম দয়াল ঠাকুর বসে আছেন ঠাকুর বাংলোতে—সুধৃতি পরিষদের সম্মুখের দালানের বারান্দায়। ঘণ্টা দুই আগে তাঁকে নিবেদন করেছি যে তাঁর দয়ায় ইংরজীতে এম. এ. পাশ করেছি। গত রাত্রে রেজাল্ট এসেছে। মহাখুশী তিনি। আমিও খুশীর হাওয়ায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক। হঠাৎ কে যেন এসে জানালো দয়াল ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন। দয়ালের সামনে হাজির হতেই সোহাগভরা কণ্ঠে বল্লেন—ও মনি! আর একটা কাম্ করা লাগবিনি। ডক্টরেট না কি আছে তাই হওয়া লাগবিনি তোমায়!

গবেষণার বিষয়বস্তুও বলে দিলেন ঠাকুর "The evolution of Dharma in the fulfilment of life and politics' (জীবন এবং রাজনীতির পরিপূরণে ধর্মের বিবর্তন)। দীর্ঘ আড়াই বৎসর নিজে নিজে চেষ্টা করে সেই থিসিস সাবমিট করলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৬৭ সালের গোড়ার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন নিরালা নিবেশে। আমি দাঁড়িয়ে আছি অদূরে বারান্দায়। দয়াল ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে তোর থিসিসের খবর কি?

আমি বল্লাম—আজ্ঞে সাবমিট তো করেছি। তিনকপি বিদেশে পাঠাবার জন্য লিখে দিয়েছি। তাই রেজাল্ট বের হতে দেরি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মাথাটি দুলিয়ে বল্লেন—তুই শালার পেত্তম (প্রথম) শাঁয়েং করবিনি! তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অফুরন্ত স্নেহধারার এক অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি।

দয়ালের এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারলাম না। কারণ এই

আশ্রমেরই ছেলে আমার ছাত্র শ্রীমান প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত ইতঃপূর্বে ডক্টরেট পেয়েছে—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর একজন কৃতীছাত্র শ্রীমান সুক্লেন্দু দাস গণিত শাস্ত্রে গবেষণা করছে। শীঘ্রই ডক্টরেট পাবে বলে আশা রাখে। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করলেন আমি প্রথম ডক্টরেট হব! ভাবছি তাঁর এ ইঙ্গিতের অর্থ কি?

হঠাৎ দয়াল ঠাকুর স্বীয় বক্ষদেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্লেন—এখানে! এখানে!

"এখানে" শব্দের অর্থ বুঝেছিলাম—"Here" অর্থাৎ এই ঠাকুর বাংলোর মধ্যে আমরা যারা থাকি তাদের মধ্যে আমি প্রথম ডক্টরেট হব। তখন তো কল্পনাও করতে পারিনি যে "এখানে" মানে তিনি স্বয়ং তাঁর জীবন-দর্শনের ওপরে বুঝাতে চাইছেন। ত্রিকালজ্ঞ মহামানবের রাতুল চরণে নত এল মাথা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দয়াল ঠাকুর ঠাকুর-বাংলোর নিরালা নিবেশে তাঁর শ্বেত-শয্যায় বসে সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে হাসছেন।

কতক্ষণ যে তন্ময় হয়েছিলাম তা জানিনা। তবে লিফটম্যানের কণ্ঠস্বর "Excuse me, this is ground floor" [মাপ করবেন, এইটিই নিচের তলা] কানে যেতেই চেতনা ফিরে এল। নেমে এলাম লিফট থেকে।

X-rox কোম্পানীতে আরও দশকপি ডুপলিকেট করার জন্য অর্ডার দেওয়া ছিল। তিনকপি নিয়ে এলাম সেখান থেকে। ডঃ বেলফোর্ড ও ডঃ জনসনের অফিসে দুখানা দিয়ে দেখা করলাম ডঃ পেরীর সঙ্গে। ডঃ পেরীর হাতে থিসিসের একটা কপি দিতেই তিনি আবেগে আমার হাত চেপে ধরলেন। বল্লেন—Dr. Biswas I am grateful to you, that you have given me a copy of your thesis. But you know Dr. Biswas, if I would get your thesis ten years ago, I would

have been a quite different man Dr. Biswas! a quite different man !!

[ডঃ বিশ্বাস। আমায় এককপি থিসিস দিলে ব'লে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ! কিন্তু শোন ডঃ বিশ্বাস—যদি দশবৎসর আগে তোমার থিসিস আমি পেতাম তাহলে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে যেতাম।]

চেয়ে দেখি ডঃ পেরীর দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সাদরে আমন্ত্রণ জানালাম ডঃ পেরিকে: যখনই ভারতে আসবেন, অনুগ্রহ করে আমাদের আশ্রমে একবার আসবেন।

ডঃ পেরী রুমাল দিয়ে তাঁর চোখদুটো মুছতে মুছতে বল্লেন—Of course. I will. [অবশ্যই যাব]।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে ফিরে এলাম আমার অ্যাপার্টমেণ্টে। আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম পরম দয়াল ঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে। গদগদকণ্ঠে বল্লাম—দয়াল! হে আমার জীবন সর্বস্ব! তোমার কথাই সত্য হল! তোমার ইচ্ছা তুমিই পূরণ করিয়ে নিলে !!

টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলাম হাতে! আমার এই কৃতকার্যতার সুসংবাদ শুনবার জন্য যিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন, আমাদের প্রত্যেকের স্বস্তি, শান্তি ও নিষ্ঠানন্দিত কৃতিদীপনাই যাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য সেই লোকদরদী প্রধান আচার্য্য শ্রীশ্রীবড়দার কাছে ওভার-সী টেলিগ্রামে নিবেদন করলাম—Doctorate degree conferred upon me by your blessings. Thousand salutations to thy lotus feet. [আপনার আশীর্বাদে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছি। শ্রীচরণকমলে সহস্র প্রণাম।]

ঘরে আর কেউ নেই! কাকে নিয়ে আনন্দ করি। ছুটে গেলাম আনন্দের অ্যাপার্টমেণ্টে। গভীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল সে! "Good news" বলতেই আবেগে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বল্ল: আমি বিশ্বাস করি যে, [তোমার ঠাকুর ঈশ্বরের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর

করুণায় অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। তুমি তাঁর ভাগ্যবান শিষ্য।]

একসেট দামী বোতাম সমেত সুন্দর বাক্স আমার হাতে দিয়ে বল্ল—This is my humble token of love for you. [তোমার জন্য আমার ভালবাসার এই ক্ষুদ্র অবদান।] বোতামটি মাথায় ঠেকিয়ে বল্লাম—আনন্দ! জানিনা কেমন করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। তবে এটা আমার ঠাকুরের স্বর্গীয় করুণা যে এখানে তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম।

এবারে ভারতবর্ষে ফেরার পালা। কিন্তু পালিয়ে যাবার তো কোন পথ নেই যে বিনা পয়সায় ফিরে যাব ভারতে। কমপক্ষে ৪৫০ ডলার লাগবে হাওয়াই জাহাজের টিকিট কিনতে। এত টাকা পাই কোথায়?

আমাদের গুরুভাই মিঃ জেমস্ মাইকেলকে বল্লাম আমার অসুবিধার কথা। তিনি আমায় বিশ ডলার দিয়ে সাহায্য করলেন। আর দুজন বন্ধুস্থানীয় আমার যাবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তাদের নাম সঠিকভাবে মনে পড়ছে না বলে দুঃখিত।

তবে যাদের নাম এখনও উজ্জল হয়ে আছে তারা হচ্ছে আমার দুইজন আমেরিকান ছাত্রী। নাম কিট্রি ও জেনেট। কিট্রি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বিবাহ হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ। নিজে একটা চাকুরী করে। তার নিজের ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে সে থাকে। পোষ্য বলতে পাঁচ-ছটা বিড়াল ও কয়েকটা কুকুর। তাদের প্রতি কিট্রির মমতা ও বাস্তব যত্ন ও পরিচর্যা না দেখলে কল্পনা করা যাবে না।

জেনেট অপেক্ষাকৃত বড়লোকের মেয়ে। বিয়ে এখনও করেনি। তবে চাকুরী করে। মা-বাবার কাছেই থাকে বলে শুনেছি। দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত! রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী সভ্য!

প্রতি শনিবার দুজনেই বাংলা শিখতে আসে আমার কাছে। দুজনে মিলে প্রতি শনিবারে দশডলার দিত আমাকে। নগদ কারবার! বেশ বাংলা শিখেছিল দুজনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্যানুসরণ পড়ত

জলের মত। দুজনেরই ইচ্ছা বাংলা শিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মর্মার্থ ভাল ক'রে বুঝবে, ভারতবর্ষে যেয়ে তাঁর লীলা নিকেতন দর্শন করবে ও তাঁরই সেবায় আত্মনিয়োগ করবে!

সেদিন কিট্টি একাই এসেছে পড়তে। জানে যে আমি ভারতে চলে যাব। কথা প্রসঙ্গে এও জেনেছে যে আমার টিকিটের টাকা জোগাড় হয়নি। কিট্টি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বল্ল—ডঃ বিশ্বাস! আমি তোমার সমস্যার কথা জেনেটকে বলেছি। সে আপনাকে টু হাণ্ড্রেড ডলার দ্বারা সাহায্য ক'রতে ইচ্ছা করে। [I mean she likes to help you with two hundred dollars.] আমি বল্লাম—কিন্তু যদি আমি আমেরিকাতে ফিরে না আসি? এলেও টাকা যদি শোধ দিতে না পারি? তাহলে—বাধা দিয়ে কিট্টি বল্লো—তাতে কিছু এসে যাবেনা। সে সুখী যে সে তোমার জন্য কিছু করতে পারছে। আমি যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারতাম! কিট্টির চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অক্ষমতার বেদনা!

সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম—দুঃখ করো না! তুমি আমার জন্য প্রচুর করেছ। আমার মনে হয় তুমিই জেনেটকে অনুপ্রাণিত করেছ আমাকে এত টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য।

প্রতিবাদ করে বল্ল কিট্টি—না, না! আমি শুধু তোমার প্রয়োজনের কথাটা তাকে বলেছিলাম।

পরদিন জেনেট এসে দুশো ডলারের একখানা চেক বের করে বল্ল: ডঃ বিশ্বাস! আমি যদি এই সামান্য অর্থ তোমাকে দেই তুমি কি কিছু মনে করবে?

মনে মনে ভাবলাম—ফকিরের আবার ধোঁয়া ঢেকুর কি? টাকার জন্য বাড়ী ফিরতে পারছি না। ধার দেবার মত কেউ নেই এদেশে! আর সে ধার ভারতে বসে শোধ দেব কি ক'রে? তাই সাধা লক্ষ্মী কি কেউ পায়ে ঠেলে? বল্লাম—কিন্তু জেনেট, এই টাকা তোমাকে ফেরৎ দেবার সম্ভাবনা নাই বল্লেই হয়।

চেকখানা আমার হাতে দিয়ে বল্ল জেনেট—কিছু ভেবোনা!

আমি খুসী যে তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে পারছ। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

শুভযাত্রার সময় হল। সম্ভবতঃ ২৬শে জুলাই (ডায়রীতে তারিখটা লেখা নাই) ১৯৭২ সাল। কাগজপত্র সব প্রস্তুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্টস্ সেন্টারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের তদানীন্তন ডাইরেক্টর মিসেস্ ওলসন্ খুবই সদয় হলেন আমার ওপরে। আইনতঃ আমি ভারতে ফিরে গেলে আর ফিরে আসতে পারব না ছাত্র হিসাবে। কারণ আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। রেজাল্টও আউট হয়ে গেছে। বাকী আছে শুধু কনভোকেশন [সমাবর্তন]। আসতে গেলে আবার "স্টুডেন্ট-ভিসা" জোগাড় করতে হবে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেট অফিস থেকে। সেটা আর সম্ভব নয়। কারণ আবার কী পড়তে আসব এদেশে?

কাগজপত্র এমনভাবে পূরণ হল যাতে বোঝা যায় আমার পড়াশুনা এখনও চলছে। প্রকৃতপক্ষে আমার তিনবছরের ভিসা ছিল ছাত্র হিসাবে। দুইবছর কোর্স শেষ করার জন্য আর অন্ততঃ একবছর থিসিস্ লিখবার জন্য। আমি যে এগার মাসে কোর্স শেষ ক'রে আর তিনমাসে থিসিস্ লিখে শেষ করেছি তা কে দেখাতে যাচ্ছে? তাই একমাসের Study leave (পড়াশুনার ছুটি) মঞ্জুর করলো বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতে যাবার কারণ হিসাবে দেখান হল "for collecting data at Satsang in India". [ভারতে অবস্থিত সৎসঙ্গে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য।] আমাকে ফিরে আসতে হবে ঠিক ৩০ দিনের মধ্যে—যদি ফিরে আসতে চাই নতুন কোন ভিসার প্রয়োজন হবে না। শুধু একবার জানিয়ে আসতে হবে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেট অফিসকে।

সন্ধ্যার পর 747 জাম্বো জেট "সম্রাট অশোক" ছাড়বে কেনেডি বিমান বন্দর থেকে। ফ্রাঙ্ক ক্যাকোনী, তার স্ত্রী, আঁদ্রে ও তার স্ত্রী সুজন, ডেভিড তার স্ত্রী গিজেলা, প্রভৃতি প্রায় ত্রিশজন গুরুভাই

ও পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী এসেছেন বিদায় জানাতে। এদের অনেকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে যেয়ে দশ ডলার বিশ ডলার কেউ বা পঞ্চাশ-ডলার হাতে দিয়ে এসেছেন। আমার টিকিট কেনা হয়ে গেছে বলা সত্ত্বেও বলেছেন—You spend it at your pleasure [তোমার খুশী মত খরচ করো]।

আমাদের ফ্লাইটের যাত্রীদের ডাক পড়ল : "Passengers are requested to proceed towards security encloser.

বিদায়ের শেষক্ষণ। সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ভালবাসা যে দেশ-কাল-পাত্রের সীমা পার হয়ে সর্বজনীন রূপ নিতে পারে তা সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করলাম। প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিরহের কাতর অভিব্যক্তি। আবেগজড়িত কণ্ঠে ঐ একই আহ্বান —রেবতী কাম ব্যাক্ এগেন। [রেবতী আবার ফিরে এস।]

প্লেন ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে ফেলে আসা পরিচিতদের আদর সোহাগ ও আলিঙ্গনের স্মৃতি। পুরানো স্মৃতি মন্থন করতে করতে উড়ে চলেছি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে। দু'বছর আগে যখন প্রথম 707 জেট প্লেনে আমেরিকার পথে পাড়ি দিয়েছিলাম সেইদিনে সেই বোকা 'আমি'র কথা মনে হতেই নিজেই হাসতে লাগলাম। সিনেমা দেখানো হবে প্লেনের ভিতরে ! বোধ হয় চারখানা পর্দা টাঙানো হয়েছে সম-দূরত্বে। একখানাতো আমারই সামনে—মাত্র কয়েকগজ দূরে।

একজন এয়ারহোসটেজ ট্রেতে করে প্লাসটিকে মোড়া কতকগুলো স্টেথোস্কোপের মত বস্তু নিয়ে হাজির। সকল যাত্রীর মত আমাকেও বল্ল—"Would you have it please, it costs two and half dollar's." [তুমি একটা নিতে চাও আড়াই ডলার লাগবে]।

শুনলাম আড়াই ডলার খরচ করে এটা নিলে সিনেমা দেখা যাবে ; মনে মনে ভাবলাম, 'আমাকে কি বাঙাল পেয়েছ ? আমার চোখের সামনে পর্দা ; এত কাছে বসে সিনেমা দেখব তার আবার

আড়াই ডলার খরচ করে ঐ যন্ত্রটা কিনতে যাব কেন ? তবুও যদি যন্ত্রটি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতাম ! ব্যবহার শেষে ফেরৎ দিতে হবে। আমাকে কি এত বোকা ভেবেছে এরা ? বেশ গম্ভীর হয়ে বল্লাম, 'no, thank you' [না, ধন্যবাদ]।

সিনেমা শো আরম্ভ হল। আমার চোখের সামনে পর্দায় দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে চলেছে কিন্তু কিছু তো বুঝতে পারছি না। কারণ কোন আওয়াজই কানে যায় না। শুধু অভিনেতা ও অভিনেতৃদের হাত, মুখ নাড়া ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে জুটছে না। তখন বুঝতে পারলাম যে, নিজে বাঙাল হয়েও যেমন নিজেকে বুঝতে প্রবাদ-বাক্যের বাঙাল নয় ভাবতে গর্ব অনুভব করেছিলাম তেমনি আওয়াজ শুনতে না পেয়ে প্রকৃত বোকা বোনে যাওয়ায় নিজের দেহাতি ভাবের জন্য নিজেই লজ্জা পেলাম। আর তো ডেকেও পাওয়া যাবেনা ঐ যন্ত্রটা। মনকে প্রবোধ দিলাম, ভালোই হয়েছে, আট ডলারের আড়াই ডলার তো বেঁচে গেল। পাশের ভদ্রলোক তার যন্ত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'Please have it.' [অনুগ্রহপূর্বক এটা গ্রহণ করুন।] ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে আপত্তি করে বল্লাম 'no thank you'। ভদ্রলোক জোর দিয়ে বল্লেন, I will sleep now, you better enjoy, if you like. [আমি এখন ঘুমোবো, তুমি বরং উপভোগ কর, যদি তোমার ভাল লাগে]। আমি এ যন্ত্রের এক প্রান্ত চেয়ারের বাম হাতলের নিচে একটি ছিদ্র-পথে ঢুকিয়ে দিতেই পর্দার ছবিগুলির কণ্ঠস্বর পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কানের ভিতরে। শুধু তাই নয়, যাত্রীদের অবসর বিনোদনের জন্য সারা যাত্রাপথে অবিরত হিন্দি ইংরাজি ও বাংলা প্রভৃতি মিশ্র ভাষায় কণ্ঠসঙ্গীত ও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলেছে। ইচ্ছামত চ্যানেল পরিবর্তন করলে রুচিমত সঙ্গীত শোনা যায়।

আমি ইচ্ছামত সঙ্গীত শুনতে লাগলাম আর পাশের ভদ্রলোকের

নাক ডাকতে শুরু করলো। আমি নিজেকে বোকা বলে মনে করতাম তবে এত যে বোকা তা আজ এই প্রথম বুঝলাম। প্রথম আসবার পথে নিজের নানা বোকামীর কথা ভাবছি। হঠাৎ বিরাট জোরে এক ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর: **Please fasten your seat belt. We are facing a heavy storm.** [অনুগ্রহ করে সীটবেল্ট বাঁধুন! আমরা প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হচ্ছি।] সহযাত্রীদের চোখেমুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। আমি দয়ালের 'নাম' করছি। জানি কোন দুর্ঘটনা হতে পারে না, কারণ তাঁর আদেশ তো এখনও পরিপালন করতে পারিনি।

যথাসময়ে বোম্বের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে এসে নামলাম। দীর্ঘ দুবছর পরে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে যে কি প্রশান্তি তা এই প্রথম অনুভব করলাম। ভারতের মানুষ যে কত মিষ্টি তা বুঝেছি বিদেশে বিরহকাতর মনের অন্তস্থলে। আজ মর্মে মর্মে জীবন্তভাবে উপভোগ করছি সেই আত্মীয় সংস্রবের মাধুর্য।

প্রায় একঘন্টাকাল কেটে গেল বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের ছাঁকনী দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে বেরিয়ে আসতে। বাইরে আসতেই দেখি আমাদের গুরুভাই শ্রীযুক্ত গোপাল ভাই দেশাই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। আমাদের প্লেন একঘন্টা লেটে ল্যাণ্ড করেছে নির্দিষ্ট সময় থেকে। সেই ভোর চারটে থেকে নিজের কার নিয়ে অপেক্ষা করছেন গোপাল ভাইদা। গুরুভাই-এর জন্য গুরুভাই-এর এই ত্যাগ তিতিক্ষা ও আপ্রাণতা সৎসঙ্গ সমাজের এক অভিনব সম্পদ। গোপালভাইদা আমাকে দেখতে পেয়েই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার হাত দুটো চেপে ধরে 'জয়গুরু' বলে স্বাগত জানালেন। নিজেই ড্রাইভ করলেন তাঁর কার। তাঁদের বাড়ীতেই এসে উঠলাম। গোপাল ভাইদার দাদা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণভাই দেশাই অবসর-প্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার। আমার থাকা-খাওয়ার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে

পড়লেন। তাঁর আপ্যায়নের তুলনা হয় না।

পরদিন বোম্বে-জনতা ট্রাই-উইকলীতে রওনা হলাম দেওঘরের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণভাইদা, গোপালভাইদা ও আরও স্থানীয় গুরুভাই স্টেশনে এলেন সী অফ করবার জন্য।

ট্রেনে তো আর কোন কাজ নেই। শুধু বসে থাকা আর নানা চিন্তার জটাজাল বিনিয়ে বিনিয়ে সময় কাটান।

মনে পড়ে গেল ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসের এক মধ্যাহ্নের ছবি। ঠাকুর বাংলোতে এসেছি কি এক কাজে। হঠাৎ 'কৃষ্ণদা' নামে এক গুরুভাই বল্লেন -আরে রেবতী দা! আপনি বিদেশে যাচ্ছেন না কেন? 'পি'-ফর্ম তো উঠে গেছে। এখন যে-কেউ যেতে পারে ট্যুরিষ্ট হিসাবে। তবে রিটার্ণ টিকিট করে যেতে হবে।

মহাখুশী আমি এ সংবাদে। যে কোন উপায়ে—এমনকি জাহাজের খালাসী হয়ে যাবার সুযোগ পেলেও তা ছাড়তে রাজী নই। রিটার্ণ-টিকিট তো কী কথা।

শ্রীশ্রীবড়দার অনুমতি পেলাম তাঁর কাছে প্রস্তাব করতেই, পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীযুক্ত কেষ্টদার (সাউ) কোন এক বন্ধু কাজ করেন দুমকা এস-পি অফিসে। তিনি পাশপোর্ট ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন ব'লে জানতে পারলাম। কেষ্টদাকে বলতেই তিনি আগ্রহভরে তাঁর বন্ধুর কাছে আমাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করে পত্র লিখে দিলেন। কেষ্টদা থেকে শুরু করে যাবার দিন পর্যন্ত গুরুভাইদের কাছ থেকে যে আগ্রহ, আন্তরিকতা শুভেচ্ছা ও বাস্তব সাহায্য পেয়েছি তার চিত্রগুলি একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে এল তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে।

২৮শে জুলাই বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় জসিডি পৌছালাম। দীর্ঘ দুবছর পরে প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে মিলনের এই মুহূর্ত জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। আশ্রমের ষ্টেশন ওয়াগন

নিয়ে রিসিভ্ করতে এসেছেন—বাবা, মেজভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার ঘোষ, ভগ্নী কল্যাণী, মেয়েরা ও আরও অনেকে।

বাসায় পৌছাতে একটা বেজে গেল। মাকে প্রণাম করেই জড়িয়ে ধরলাম আবেগে। মা কোন কথা বল্লেন না। শুধু নীরবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন দু-চারবার।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কিন্তু আর একজনকে দেখতে পাচ্ছি না। যার প্রেরণা ও সহযোগিতা আমার জীবনে শুধু অপরিহার্যই নয়, অপরিমেয় শক্তি জুগিয়েছে—সেই স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি না। আর একবার দেখবার চেষ্টা ক'রে স্যুটকেশ খুলে ফেল্লাম। এটা আমার চিরদিনের স্বভাব। বাইরে থেকে যখনই ফিরি, ছেলে-মেয়েদের হাতে তা দেবই।

স্যুটকেশ খুলতেই মা বল্লেন—পরে খুলিস। এতদূর থেকে আসিল। আগে বিশ্রাম কর। ততক্ষণ স্যুটকেশ খোলা হয়ে গেছে। বোম্বে থেকে মেয়েদের জন্য ভাল দামের ফ্রক ও প্যান্ট কিনে এনেছি। প্রথম ফ্রকটি সামনে দাঁড়ান বড়মেয়ে মাঙ্কুর হাতে দিয়ে বল্লাম—মাঙ্কুবুড়ি এই নাও এটা তোমার। বড় মেয়েকে আদর করে মাঙ্কুবুড়ি, কখনও মাঙ্কুলী বলে ডাকি।

দ্বিতীয় ফ্রকটি হাতে নিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছি। সবচাইতে ছোট মেয়ে বন্দনাকে দেখছি না। তাইতো তাকে তো একবারও দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলাম—বন্দনা কোথায়? বন্দনাকে তো দেখছি না!

মা বল্লেন—আছে। তুই এখন রাখ না কেন?

মুহূর্তে যেন সহস্র বিদ্যুতের ধারা খেলে গেল মাথার মধ্যে। চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন সুদূর নীহারিকামণ্ডল থেকে হাত বাড়িয়ে বন্দনা বলছে—বাবা দে।

ফ্রকটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে বল্লাম—বুঝেছি কোথায় আছে!

সমস্ত পরিবেশটা থমথম হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত সকলেই নির্বাক। মার চোখে জল।

উঠে গেলাম আমার ঘরে। স্ত্রী এক কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছে। কাছে যেতেই আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল : ওগো তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার কাছে মিথ্যা কথা লিখেছি।

আমার বুকের পাঁজরের বাঁধন ভেঙ্গে কান্নার স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়ের জন্য নয়। স্ত্রীর জন্য। সন্তান হারানোর ব্যথা মায়ের বুককে কিভাবে মথিত ক'রে তোলে তা সন্তান-বিয়োগ বধুরা প্রতিটি মা-ই জানে। আর সে ব্যথা যদি 'মা' তার স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে না পারে, গোপনে চেপে রাখতে হয় তাকে, তাহলে তার যে কি জ্বালা তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। সারাটা শরীর যেন সে জ্বালায় পুড়ে কালো হয়ে গেছে। সে রঙও নাই, সে দীপ্তিও নাই। কঙ্কালসার দেহে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণপাখি বুঝি অপেক্ষা করছে এই "ক্ষমা কর" কথাটি বলবার জন্য।

সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম : তুমি তো কোন অপরাধ করনি লক্ষ্মী ! তুমি বরং আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় ভুল বুঝেছি। আজ বুঝতে পারছি একবৎসর আগে সেদিনের সে চিঠির প্রতিটি ছত্র কেন ভিজে আবছা হয়ে গিয়েছিল। সে তো বৃষ্টির জল নয়। তোমার চোখের জল।

চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বল্লাম—তা তুমি আমায় জানালে না কেন ? এতবড় একটা সন্তান-শোক বুকে চেপে রেখে নিজেকে যে শেষ করে ফেলেছ !

আবেগ-বিজড়িত কণ্ঠে বল্ল—তোমাকে জানালেই তুমি যে ফিরে আসতে ! তাতে কি আর মেয়েকে ফিরে পেতাম ! মাঝখান থেকে ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণে বাধা পড়ে যেত চিরদিনের জন্য। ইষ্টকাজে তোমার ব্যর্থতার শোক যে আরও বেশী জ্বালা দিত আমায়।

ভাবা আমার নীরব। ভাবনার অতীত এই অভিজ্ঞতা ! দয়াল ঠাকুরের দিকে চেয়ে শুধু মনে মনে প্রার্থনা করলাম—দয়াল তোমার করুণাতেই এ সম্ভব। তুমি সান্ত্বনা দাও তোমার সন্তানকে।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ১৯২৯ সালে অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়। ১৯৪৭ সালে ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি) হাইস্কুল হ'তে ম্যাট্রিক ও ১৯৫২ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হ'তে বি. এস. সি. পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে দেওঘরে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের দর্শণে আসেন এবং দীক্ষা নেন। ১৯৬৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ইংরাজিতে (Private) M.A. পাশ করেন। সৎসঙ্গের 'প্রধান আচার্য শ্রীশ্রী বড়দার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ১৯৭০ সালে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন দর্শণের ওপর গবেষণা করে ১৯৭২ সালে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শণশাস্ত্রে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে সৎসঙ্গের সহ-সম্পাদক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তা ছাড়া, বর্তমানে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুমুখী দর্শনের ওপর ভাষণ দিয়ে থাকেন।